রিইউনিয়ন

বুদ্ধদেব গুহ



রিইউনিয়ন

বুদ্ধদেব গুহ

রেসনস্
১৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ ঃ

বৈশাখ, ১৩৬১

প্রকাশক ঃ

কালবেলা

৬৫, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৬

মুদ্রণ

শ্রী রণজিৎ কুমার জানা

নিউ গঙ্গামাতা প্রিন্টিং

১৯ডি / এইচ / ২৬ গোয়াবাগান স্ট্রিট

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

ইমদাদুল হক মিলন
কল্যাণীয়াসু

আশ্চর্য ! বাহান্ন বছর বয়স হল আর আজ অবধি শান্তিনিকেতনে আসেননি একবারও ।

হাসি বলল ।

নাঃ ।

এয়ার-কন্ডিশানড চেয়ার কারের টিকিট কেটেছে হাসি । সকাল ন'টা চল্লিশে ছেড়ে দুপুরের খাওয়ার সময়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে যায় । মধ্যে, একমাত্র বর্ধমানেই থামে ।

হাসি বলল, জানেন তো, এই ট্রেনটি বাংলার বাঘের বাচ্চা গনিখান চৌধুরীর দান, যখন উনি রেলমন্ত্রী ছিলেন । বাঙালি মন্ত্রী তো গণ্ডায় গণ্ডায় কেন্দ্রে ছিলেন এবং এখনও আছেন, রাজ্যের জন্যে কে কি করেছেন ?

হয়তো করেছেন । আমরা কি সব খবর রাখি । ট্রেনে সাধারণে চড়ে তাই ট্রেনের কথাটা জানো ।

হবে হয়তো ।

হাসি আবারও বলল, সত্যি এতোগুলো বছর করলেন কি তাহলে ? কলকাতাতেই পচে মরলেন ?

তুমি কি জানো হাসি যে কলকাতাতেই লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ আছেন যাঁরা কখনও ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা অথবা বটানিক্যাল গার্ডেনও দেখেননি । অবস্থার কারণেই যে দেখেননি তাই শুধু নয়, অভ্যেসের নিগড়ই ছিঁড়তে পারেননি । কেউ নিয়ে যাননি তাঁদের হাত ধরে । শান্তিনিকেতনে আসা এমন কি কঠিন ছিল ? কিন্তু তুমি হাতে ধরে নিয়ে এলে বলেই-না আসা হল ।

হাসি বলল হেসে, তাই ?

তারপরে বলল, শান্তিনিকেতনে না-হয় কেউই হাত ধরে নিয়ে যায়নি বলেই আসেননি কিন্তু করলেনটা কী এতগুলো বছর । কিছু তো করলেন !

কেরানিগিরি ।

তার আগে ?

কেরানিগিরির জন্যে পড়াশুনো।

কেরানিগিরিই কেন ? অন্য কিছু নয় কেন ? আপনার কি ভাল পরতে, ভাল বাড়িতে থাকতে, ভাল গাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করেনি কোনওদিনও ? সেই স্কুল জীবন থেকেই কি কেরানিগিরিকেই একমাত্র গন্তব্য করেছিলেন ? ওনলি অ্যামবিশান ?

ঠিক তা নয়। একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম।

তারপর বললাম, হয়তো আবার তাই-ই। আমার রক্তর মধ্যেই জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ছিল না। May be, it did not run in the blood. অনেকের পরিবারে, বংশপরম্পরায়, রক্তে অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সা থাকে। আমাদের পরিবার একেবারে টিপিক্যাল বাঙালি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, সাহিত্য, গান-বাজনা, হাসি, গল্প, আড্ডা এই সব নিয়েই ছিল। আমাদের মামাবাড়িও ওরকম। তুমি তো ওঁদের খুব কাছ থেকেই দেখেছ। বলতে গেলে, তুমি তো আমার মামাতো বোনই।

হ্যাঁ, বলতে গেলে।

তারপর বলল, আমরা মুসলমান হলে আপনাকে বিয়ে করতেও কোনও বাধা ছিল না। তাই না ?

হুঁ। মুসলমান না হলেও ছিল না ?

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

একটু পরে বললাম, তাছাড়া অনেক অনেক জাগতিক প্রাপ্তি, অনেক টাকা, বড় বাড়ি, দারুণ দারুণ গাড়ি এ-সবের সঙ্গে আনন্দ বা শান্তির কোনও সম্পর্ক আছে কি ? গত মাসের শেষ রবিবারে সল্ট লেক-এ আমার এবং গদাই-এরও বন্ধু, ঝাবুর শ্বশুরবাড়িতে আমাদের, মানে, আমার এবং তোমার স্বামীর সহপাঠীদের দেখে কি একবারও মনে হয়েছিল তোমার যে, অর্থ বা ক্ষমতা বা যশের সঙ্গে আনন্দ বা সুখের আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে ?

হাসি হাসল। দুর্জ্ঞেয় হাসি। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে ও বাইরে তাকালো।

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছিল। ভরা শ্রাবণ। এ-বছর এবং গত বছরেও খুবই বৃষ্টি হয়েছে বর্ষার প্রথম থেকেই। সবুজে সবুজ হয়ে গেছে উষর পৃথিবী। হাসির পৃথিবীও সবুজ হয়েছে সম্ভবত মাসখানেক আগে থেকে। তবে ওই শ্যামলিমা বৃষ্টি নির্ভর নয়। এখনও নয়। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে।

হাসি, আমার কথার উত্তরে বলল, আমার স্বামীর বন্ধুদের দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়নি আমাকে। আপনার, আমার বন্ধুকে দেখাই যথেষ্ট ছিল। অর্থ আর আরাম, আর সুখ শান্তি যে সমার্থক নয়, তা আমার মতো করে খুব কম মানুষই বুঝেছে।

কেন ? অন্যে বোঝেনি কেন ? আমিও যে বুঝেছি তাও তো বললামই।

এই জন্যে বলছি যে, একেকজনের বোঝা একেকরকম। অন্যেরা বোঝেনি বলছি এই জন্যে যে, এই নির্মম সত্যকে বুঝেছি আমার জীবন দিয়ে। আমার পাঁচটা নয়, দশটা নয় ; একটা মাত্র জীবন দিয়ে।

আমি বুঝি জীবন দিয়ে বুঝিনি ! বললাম, অনুযোগের সুরে।

অন্য-চালিত গাড়িতে প্যাসেঞ্জার হয়ে বসে জীবনকে কেউ কেউ দেখে। মৃত্যুর দিকে নিজেদের অজানিতে দ্রুত ছুটে-যাওয়া জীবনের পথের দু'পাশেও কত কি ছুটে যায় বিপরীতে। কত ফুল, কত পাখি, কত গাছ, কত মানুষ-মানুষী, শিশুর মুখ, কত মোড়—CROSS ROADS—অথচ তাদের ভাল করে দেখতে পাওয়া বা বুঝতে পারার আগেই তাদের জীবন তাদের নাগাল ছাড়িয়ে, হাত ছাড়িয়ে চলে যায় দূরে। কারণ নিরানব্বই ভাগ মানুষই গন্তব্য যে কি তা না জেনেই গন্তব্যে পৌঁছনোকেই চলার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস করে। এ নিয়ে ভাবাভাবির মানসিকতাই নেই অধিকাংশ মানুষের। আবার কেউ-কেউ, তাঁরা হয়তো ভগ্নাংশ এক ; জেনে শুনেই চলেন, নিজের নিজেরই ইচ্ছাতে, তাঁরা হয়তো প্রথম থেকেই জানেন যে তাঁরা কী চান। পরনির্দেশে, পরচালিত যন্ত্রযানে বসে, সারাটা জীবনে তাঁরা অপারগ যাত্রী বা দর্শকের আসনে বসেই কাটিয়ে দেন না। পথে কোনও সুন্দর ফুলে-ছাওয়া গাছ দেখলে, তাঁরা থামেন, নামেন। কুলকুল-করে বয়ে-যাওয়া কোনও বনপ্রান্তে বাঁক নেওয়া কোনও নদী দেখলে, কোনও ছায়াচ্ছন্ন সুগন্ধি পাহাড়তলিতে পৌঁছলে তাঁরা থেমে সেখানে কাটিয়ে যান যতক্ষণ ভাল লাগে, ততক্ষণ। চলার মধ্যেই যে এক বিশেষ আনন্দ আছে, অন্য নির্দেশিত, অন্য নির্দ্ধারিত কোনও অলীক গন্তব্যর দিকে ভূতগ্রস্ত হয়ে ধাবমান হওয়া আর বাঁচা যে সমার্থক নয়, তা তাঁরা জানেন। আনন্দের কথা হাসি, যে তোমারই মতো আরও কিছু মানুষ ব্যতিক্রমী। গড্ডালিকায় গা ভাসান না তাঁরা।

হাসি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস বর্ধমান পেরিয়ে গেছে। ওরা নুন-গোলমরিচের গুঁড়ো দেওয়া চা খেয়েছিল—লিকার, একটু আগেই। একজন অন্ধ বাউল গান গেয়ে ফেরেন এই ট্রেনে। নিত্য যাত্রীরা ওকে জানেন। একটা টাকা দিলো হাসি। বড়লোকের বউ। কী একটা ছোট্ট স্টেশন পেরুল ট্রেনটা। নামটা পড়তে পারলাম না; বৃষ্টি-ভেজা প্লাটফর্ম, দু' তিনটে লাল-কালো কুকুর—একটা আতা গাছ—নতুন ইটের নিচু পাঁচিল দিয়ে গোল করে ঘিরে রাখা কয়েকটি নতুন লাগানো গাছ।

কাগজে পড়েছিলাম বৃক্ষরোপণের কথা। কোন একটা কাগজে যেন ছবিও ছেপেছিল সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, আরও কোনও কোনও সেলিব্রিটিজদের। অত মনে নেই কারা ছিলেন। কলকাতার 'নন্দন'-এর সামনে বৃক্ষরোপণ করছেন।

"পুষ্প বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে", গানটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। কেন মনে পড়ল তা জানি না।

ছেলেবেলাতে নির্জন, শান্ত, কৃষ্ণনগরের চূর্ণী নদীর পারে আমার অতি সামান্য হাত-খরচের টাকা এবং মামিমাদের দেওয়া সামান্য উপহারের অর্থ দিয়ে রথের মেলা থেকে গাছ কিনে আমি আর হাঁসির খুড়তুতো দাদা, আমারই সমবয়সী বিজু, দুজনে মিলে কত গাছ যে লাগাতাম প্রতি বছরেই তা আমরাই জানি। আমাদের ছবি ছাপা হয়নি কাগজে। ছাপতে এলে বারণও করতাম। গর্ভাধানেরই মতো, বৃক্ষরোপণও বড় নিভৃত উৎসব। এতে ঢাক-ঢোল পেটাতে নেই, নীরবে, গোপনে করাই ভাল। নইলে গাছ লজ্জা পায়, রেগে যায়। হয়তো বাঁচেও না, সে-কারণেই।

জানি না, আমার আর বিজুর লাগানো (বিজু বাইশ বছরে মারা যায় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায়) সেই সব গাছেদের একটিও গরু আর গরুরই মতো নির্বোধ মানুষেরা বাঁচতে দিয়েছে কি-না!

যত গাছ লাগানো যায়, তার সবই কি বাঁচে?

ভাবছিলাম আমি। সব যে বাঁচে না, তা সকলেই জানে। তবু কিছু বাঁচলেও তো খুবই আনন্দর কথা হতো। তা ছাড়া মানুষ কি শুধু মাটিতে বা নদীপারেই লাগায় গাছ? নিজের বুকেও কি লাগায় না? গাছ, ঝোপ, ঝাড়, লতা; সুগন্ধি ফুল ও পাতা বুকের মর্মস্থলে?

হাসিকেও তো বড় যতন ভরে আমার মর্মমূলের যত জঞ্জাল সব উপড়ে ফেলে সেখানেই লাগিয়েছিলাম পারিজাত ফুলের গাছেরই মতো একদিন সে আমার সমস্ত আমিকে পারিজাতের সুগন্ধে ভরে

দেবে বলে। সে-কথা না জানে হাসি, না জানে বিজু, না জানে আকাশ, বাতাস অথবা কোনও বৃষ্টি-ভেজা দুটি ডানা ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে-যাওয়া কোনও আঁশটে গন্ধ-পাখি। অথচ, অবশ্যই লাগিয়েছিলাম। সেই কোমল ভালবাসার গাছকে সজোরে উৎপাটিত করেছিল আমারই সহপাঠী গদাই এবং হাসির শুভার্থী গুরুজনেরা। তখন অবশ্য জানতাম না যে সেই কাঠুরে কে! জেনেছিলাম, অনেক অনেক পরে। পরেই বলব সেকথা। সেই উৎপাটিত, ফুল না-ফোটানো হাসি—গাছটির শিকড়-বাকড়ে যে আমার হৃদয়ের রক্তর সঙ্গে মাখামাখি হয়েছিল আমার শিরা-উপশিরা, স্নায়ু আর তন্ত্র, ছিন্নভিন্ন, লণ্ডভণ্ড হয়ে, সেকথা তো ওরা কেউই জানেনি! হয়তো হাসি নিজেও জানেনি। থাক। আজ এতদিন পরে...

কি লাভ? ভাবতেও ভাল লাগছে, ভাল লাগছে মানে, বিশ্বাস হচ্ছে না যে, সেই হাসির পাশে বসে আমি চলেছি, হাসিরই নিমন্ত্রণে, হাসিরই বাড়িতে।

হাসি হঠাৎই বলল, অবুদা, আপনি সুমনের গান শুনেছেন?

তিনি কে?

সে কী! আপনি খবরের কাগজও পড়েন না?

না।

কেন?

নষ্ট করার মতো সময় নেই বলে।

ভাবা 'যায় না। বলেন কী আপনি? একজন শিক্ষিত মানুষ খবরের কাগজ পড়েন না?

থাকে কী খবরের কাগজে? কিছু মিথ্যে, বানানো কথা, কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তোল্লাই-ফেল্লাই-এর হরকৎ আর সামান্য কিছু সত্যি কথা। সত্যি যতটুকু তা এমনিতেই জানা যায়, বাসে মিনিতে, পথ চলতে চলতে পাশের বাড়ির রেডিওতে আর মিথ্যে যেটুকু, যেটুকুর জন্যে কাগজ না পড়লে আমার তো বটেই, পৃথিবীর কারওই কিছু এসে যায় না। বরং শান্তি বিঘ্নিত হয় না। ইন ফ্যাক্ট যা শুনি সকলের কাছ থেকেই, সেদিন আমাদের অনাবাসী বন্ধুরাও যা বলছিল, তাতে তো এই বিশ্বাসই দৃঢ় হল যে পৃথিবীর যেসব দেশকে 'সভ্য' বলে জানে মানুষে, সেখানে খবরের কাগজ আজকাল কেউই পড়েন না। সময় নষ্ট করার মতো সময় কোথায় মানুষের।

দৌড়বীর মানুষেরা না-হয় খবরের কাগজ না-ই পড়েন, সাহিত্য তো পড়েন।

অবশ্যই। সাহিত্য, মানুষকে পড়তেই হবে, মানুষ যত দিন বাঁচে। সাহিত্য যে-মানুষ পড়ে না, তাঁর মনুষ্যত্ব এখনও পূর্ণ-বিকশিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

উষ্মার সঙ্গে বলল হাসি, আপনি টি.ভি.ও দেখেন না ?

না।

কেন ?

ইডিয়্যট-বক্স বলে। পঙ্কজ সাহার দাড়ি দেখতে হবে বলে।

হাসি বলল, আচ্ছা। এবারে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। এই সুন্দর শ্রাবণের সকালটাই দিলেন আপনি মাটি করে। ব্যাচেলর মানুষেরা যে অভ্যেসে এরকম হবেন, তা আমার অবশ্য আগেই জানা উচিত ছিল।

এ কথা বলছ কেন ?

বলছি এজন্যে যে, আপনার কথার তোড়ে বাধা দেবার তো কেউই নেই। স্ত্রী থাকলে কি আর লাগাতার এক তরফা এরকম বক্তৃতা চালিয়ে যাওয়ার অভ্যেস গড়ে উঠতে পারতো ? চারটি কথা বলার পরই চুপ করতে হতো তাঁর ধমকে।

আমি হাসলাম।

তারপর বললাম, এটা একটা ভাববার মতো কথা বটে। তবে, স্ত্রী না থাকলেও বউদিরা আছেন। সব সময়ে শাসিতই থাকি। আমাকে তাঁরা দেওরের মতো দেখেন না, প্রায় সন্তানের মতোই দেখেন। এক ছোট বউদি ছাড়া। তাঁর বয়স প্রায় আমারই সমান। তবু সম্পর্কের কারণে তাঁকেও মান্যিগণ্যি করতে হয়। তবে এ-কথা ঠিক যে, বড়দের কাছে কথায় কথায়ই ধমক খেতে হয়। কী বলবো ! আমার যেন বুড়ো হওয়ার অধিকারটুকুও নেই। কী বিপদ ! আর কয়েকবছর পরেই যে তাঁদের 'পচা'ও রিটায়ার করবে, ইসাবগুল, চ্যবনপ্রাশ, ত্রিফলা এসবের সঙ্গে নিত্য-সহবাস করবে, হট-ওয়াটার ব্যাগ হবে চব্বিশঘণ্টার সঙ্গী ; এ-কথা কে বোঝে বলো ! আসলে, আমার ছোড়দা ছাড়া অন্য সব দাদারাই তো বহুদিন হল রিটায়ার্ড। তাই, পরিবারে রিটায়ারমেন্টটা জল-ভাত হয়ে গেছে। যেসব মানুষের আর রোজগার করার যোগ্যতা এবং শারীরিক ক্ষমতাও নেই এবং সঞ্চয় বলতেও তেমন কিছু নেই, তাঁদের স্ত্রীরাও বড়ই হেনস্থা করেন তাঁদের। তাঁদের চোখের সামনে দেখে মাঝে-মাঝে ভাবি, বিয়ে করিনি যে ; একদিক দিয়ে বেঁচেই গেছি। বুড়ো বয়সে শান্তিতে থাকবো। কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ব। এত দিন তো কূপমণ্ডুক হয়েই কলকাতাতে জীবন কাটিয়ে দিলাম। মনটাও

বোধহয় ছোট হয়ে যায়, গেছে। উত্তর কলকাতার এই অন্ধগলির আধো-অন্ধকার এক গর্তে সারাটা জীবন কাটানোতে।

ভারী ভাল লাগছিল আমার। ভারী ভাল! আমি যে সত্যিই হাসির পাশে বসে হাওড়া থেকে আসছি গল্প করতে করতে, হাসির বাড়িতে গিয়ে উঠব, সেখানে তিনটি দিন তার কাছে থাকব এই ভাবনাটাই আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

বুড়ো বয়স, বুড়ো বয়স করবেন না তো!

রেগে উঠে বলল হাসি।

আজকাল আবার এই বয়সে কেউ বুড়ো হয় নাকি! পশ্চিমে আশি-নব্বুইতে বিয়ে করছে মানুষে।

তারপরই বলল, তবে দেশভ্রমণ অবশ্যই করবেন। দেশভ্রমণের মতো এতো বড় শিক্ষা তো আর দু'টি নেই।

বলেই, বলল, আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে।

ঠাট্টা করছ! তুমি তো সারা পৃথিবীই ঘুরেছ হাসি। তাই নয়? গদাই বলছিল।

হ্যাঁ ঠিক। তবে শুধু ঘুরেইছি। অন্যের কাছে গল্প করাব জন্যে। বাপের বাড়ির, শ্বশুর বাড়ির গরিব আত্মীয়দের ঈর্ষান্বিত করার জন্যে। "দেশ দেখা" যাকে বলে, তা হয়নি। দেশ দেখার অনেক রকম থাকে। কেউ প্যারিসে গিয়ে লুভর্ দেখে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে, কেউ দেখে নাইট-ক্লাবে লাইভ-শো। লাইভ-শোও জীবনের একটা দিক, আবার লুভরও অন্য দিক। দুটোর কোনওটাই ফ্যালনা নয়। দুই দেখতে পারলে ভাল হয় তবে আপনার বন্ধু...

তারপর কী ভেবে হাসি বলল, আপনার বন্ধুর চোখ দুটো খুব বড় বড়। গরু মোষেরই মতো প্রায়। কিন্তু আসলে তার চোখ নেই। চোখ ক'জনেরই-বা থাকে! যাদের সুযোগ থাকে দেখার, তাদের অধিকাংশরই চোখ থাকে না। মজা করার, শখ পূর্ণ করার এই তো বয়স। এই তো সময়। বুড়ো বুড়ো একদম করবেন না।

পশ্চিমের মানুষদের সঙ্গে আমাদের তুলনা! তারা ষাঁড়ের ডালনা খায়। আর বাঙালি কেরানি পঞ্চাশেই বুড়ো। পশ্চিমের দেশের মানুষেরা যৌবন রাখতে জানে।

আপনাদের যৌবন রাখতে কি কেউ মাথার দিব্যি গেলে বারণ করেছিল? আর যৌবন মানে কি শুধুই শরীর।

হাসি বলল।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা একটা কালভার্ট পেরুলো। ট্রেনের

গতিটাও যেন শ্লথ হয়ে এল। বাঁদিকে শনের চালের কুঁড়ে ঘর, বৃষ্টিতে ভিজে কালো দেখাচ্ছে। কালো আকাশের পটভূমিতে সাদা বকের পাঁতি উড়ে যাচ্ছে। চারদিকে সবুজ। চাপ চাপ সবুজ ঘাস।

আর মিনিট দশেক!

স্বগতোক্তি করল হাসি।

হাসির চোখে মুখে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করলাম আমি।

কেরানি পচার বড় ভয় করতে লাগল। আমার জীবনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রধান একটির কথা মনে হল। একবার গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে অফিসের গাড়ি করে বর্ধমান অবধি গেছিলাম। রাতের বেলা এক সহকর্মীর সঙ্গে। কী সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা! বড় বড় ট্রাক, বাস, মুহুর্মুহু রাক্ষসের মতো আলো জ্বেলে বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসছে। যে-কোনও মুহূর্তেই দুর্ঘটনাতে মরে যেতে পারতাম। বড় ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। আমার মুখে সেকথা শুনে আমার আরেক সহকর্মী হেসেই বাঁচে না।

বলেছিল, মা-ন-তু। এই নইলে কলকাতার বীর! আর আজকে আবার সেই রকমই ভয় পেলাম। অথচ কোথাও কোনও উত্তেজনার কিছু নেই। বাইরে নেই। বুঝলাম যে, উত্তেজনাটা ভিতরে। বুকের মধ্যে খুব দ্রুতগতি প্রচণ্ড শব্দময় অনেক ট্রাক মুহুর্মুহু যাওয়া-আসা করছে। আমি বুঝতে পারছি। অথচ বাইরে থেকে কেউই কিছুমাত্রই বুঝতে পারছে না।

আর ক' মিনিট।

হাসি আবার বলল, খুব খুশির গলাতে।

তারপর?

তারপর শান্তিনিতেকন। আমাদের ডেস্টিনেশান।

আমার ভয় করছে।

আমি ফিসফিস করেই বললাম।

তারপরই বললাম, জানতামই করবে। তবুও...

কিন্তু কেন? ভয়টা কিসের? আপনার নিজের মুখেই শুনতে চাই।

তোমার ফাঁকা বাড়িতে আমি আর তুমি! লোকে কী বলবে?

সত্যি! শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছনোর পরে আপনার এ-কথা মনে হল! হাওড়াতে ট্রেন ছাড়ার আগে মনে হলেও না-হয় নেমে যেতে পারতেন!

তারপর বলল, বাড়ি ফাঁকা নয়। এই ট্রাজেডি। এই পৃথিবীতে

বড়ই ভিড় অবুদা। সব জায়গাতেই কোনও মানুষেরই জীবনে নির্জনতা বলে কিছুমাত্রই নেই। প্রাইভেসি নেই। বিশেষ করে এ-দেশে।

হাসি আমাকে বলেই নিয়েছিল যে আমাকে সে আমার এই বিচ্ছিরি ডাকনাম 'পচা' বলে ডাকতে পারবে না এবং কখনওই ডাকবে না। ছেলেবেলাতে ওদের বাড়ির সকলেই আমাকে অবু বলেই ডাকতেন। হাসি বলত অবুদা। অবনী থেকে না হয় অবু হতেও পারতো কিন্তু অর্ণব থেকে কেন অবু হল কোনওদিনই বুঝতে পারিনি তা!

গদাই জানতে পারবে না ভবিষ্যতে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ভাবছিলাম যে, যেদিন থেকে এখানে আসার কথা হচ্ছে সেদিন থেকেই তো আমার জানা ছিল যে, হাসির সঙ্গে আমি একাই আসবো। হাসির মনে তো কোনও অপরাধবোধ বা ভয় নেই। সেসব যত আমারই মনে। আসলে আমি বোধহয় মনে মনে বড় গোঁড়া, প্রাচীনপন্থীই রয়ে গেছি। উত্তর কলকাতাতে সম্ভবত আধুনিকতার হাওয়া এসে পৌঁছতে আরও সময় লাগবে কয়েক যুগ। তাই কি! নাকি আমিই...

হাসি, দৃঢ় গলাতে বলল, ভবিষ্যতে কেন? অশেষবাবুকে মানে আপনার বন্ধু গদাইকে তো বলেই এসেছি। কালই বম্বে থেকে ফোন করেছিল। সে আবার কী বলবে! ভাববেটাই বা কী? আমি তার অনেক পজেশানের মধ্যে একটা পজেশানমাত্র! বাড়ির ফার্নিচার এদিক-ওদিক করলেও হয়তো তার চোখে পড়তো। সালুকি কুকুরকে তার নির্ধারিত জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গাতে বাঁধলেও হয়তো তার চোখে পড়বে কিন্তু আমি আছি কি নেই, তা দেখার চোখ আপনার বন্ধু অশেষবাবুর কোনওদিনও ছিল না অবুদা।

গদাইকে কি তুমি অশেষবাবু বলে ডাকো নাকি?

হ্যাঁ।

কেন? আশ্চর্য তো!

আজ অবধি মানুষটাকে আপন ভাবতে পারলাম না। তাই দূরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি, "আপনি" বলি, "অশেষবাবু" বলি। যদিও "বাবু" সম্বোধনটা ওর আদৌ পছন্দর নয়। কিন্তু এক ঘরে, এক বিছানাতে শুলেই কি কারোকে শুধু সেই জন্যেই "তুমি" বলা যায়? আপনি থেকে "তুমি"তে নামা কি সোজা কথা। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কখনওই পারা যায় না। পারা হয়তো উচিতও নয়।

অনেকসময়ে এক জীবনে হয়েই ওঠে না।

জানি না বাবা।

আমি বললাম।

তারপর কথা ঘুরিয়ে বললাম, তোমার বাড়িতে মালি নেই ?

মানে শান্তিনিকেতনে ?

হ্যাঁ।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে বাড়িটা আমার নয়। যে সব স্ত্রীরা যা-কিছুই স্বামীর তার সব কিছুকেই নিজের বলে মনে করেন আমি তাদের দলে পড়ি না। গাছেরটাও খাব তলারটাও কুড়োব এমন মানসিকতা ছাড়তে পারেন না বলেই হয়তো নারী-স্বাধীনতার প্রকৃতিটা এমন খিচুড়ি হয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনের বাড়িটি অশেষবাবুরই বাড়ি।

মালি আছে তো ! নাকি একদম ফাঁকা।

একজন নয়, তিনজন মালি আছে। একজন বেয়ারা এবং একজন বাবুর্চিও আছে। একটি মারুতি এইট হাড্রেড গাড়ি আছে। তার ড্রাইভারও আছে এখানেই থাকে সে। শান্তিনিকেতনের রাস্তাঘাট চওড়া নয় তো বিশেষ, তাই বড় গাড়ি রাখেনি আপনার বন্ধু এখানে।

কাল বম্বে থেকে ফোন করেছিল তোমাকে গদাই ? কেন ?

হাসি বলল, বাইরে যেখানেই থাকুক, দেশে বা বিদেশে প্রতিদিনই একবার করে ফোন করেই আমাকে। অফিসে তো বহুবারই করে।

কেন ?

জানি না।

তারপর হেসে বলল, হয়তো নিঃসন্দেহে হতে চায়, চেস্টিটি বেল্টটা পরে আছি কি নেই !

তারপর বলল, এই রকমই রেওয়াজ। বউকে "আই লাভ উ্যু, আই মিস উ্যু হানি"। এইসব বলতে হয়। মিথ্যেটা সব সময়ই সত্যর চেয়ে ভারী হয়তো ! এই নিয়ম।

তাই বুঝি ? গদাই এইরকম সাহেব হয়ে গেছে ? সত্যি ?

হ্যাঁ। কেউকেটা হলে মানুষের কত কিছুই করতে হয় ; জানতে হয়। কম ঝক্কি !

বললে না, কাল কী বলল ও ? মানে, গদাই।

হ্যাঁ। কাল বলল, আগামী শুক্রবার রাতে আমেরিকান ইমপোর্টার আসছেন শিকাগো থেকে। ওঁদের নিয়ে তাজ বেঙ্গলে খেতে যাবে, তবে ওর এমন প্রাসাদোপম লনওয়ালা বাড়ি না দেখালে, চলবে কি

করে ! লন-এ বার সেট-আপ করবে। পার্মানেন্ট বন্দোবস্ত আছে। সঙ্গে ওদের ক্লাবের কিছু কমিটি মেম্বারদেরও নাকি ডেকেছে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। তোমাদের রিইউনিয়নটা গুটলুবাবু সল্ট লেকেই ঝাবুবাবুর শ্বশুরবাড়িতে করাতে ও খুবই রেগে গেছিল। নিজের বাড়ি দেখাতে পারল না বন্ধুদের !

ক্লাবের বন্ধুদের কেন ডেকেছে ?

মানে, আপনার বন্ধুর খুব ইচ্ছে যে, সুতানুটি ক্লাবের কমিটিতে ঢুকবে। এই বছরই ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে। তাই এখন থেকেই মাখামাখি চলছে আর কী। রোজই পার্টি লেগে আছে। বললে তো যে রোটারিরও কয়েকজনকে বলবে। ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর তো আছেই ! আমার নাম সেখানে "অ্যানি" হাসি।

অ্যানি ? সেটা কি বস্তু ?

আমিও জানি না। রোটারিয়ানদের স্ত্রীদের ওইরকমভাবেই ডাকা হয়।

ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মানে ? কোন ডিস্ট্রিক্ট ? তা হলে অ্যানি বেসান্ট কি কোনও রোটারিয়ানের স্ত্রী ছিলেন ?

হেসে ফেলল হাসি। সম্ভবত আমার নির্বুদ্ধিতায়।

আমি হাসির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, বোকার মতো।

আরেকটা গ্রান্ড পার্টি হবে আগামী মাসের প্রথম শনিবারে। ঠিক হয়েই আছে।

কেন ?

অশেষবাবু কনসাল হয়েছেন।

গদাই ! আমাদের গদাই কনসাল হয়েছে ? গুটলুকে তো জানাতে হবে। বলো কি তুমি ! ও এত বড় হয়ে গেছে।

ভাবা যায় না, সত্যি। এটা গুটলুবাবু বা আপনার লেভেল-এর ঘটনা নয় অবুদা। সমাজের ওই স্তরে কোনও ঢেউ উঠবে না ওই খবরে।

কেন ?

কারণ, ওরকম কনসাল বা ট্রেড রিপ্রেজেনটিটিভ অনেকেই আছেন। আপনি কি ভাবলেন আপনার বন্ধু ফ্রান্স বা জার্মানির কনসাল হয়েছে ?

তা কোন দেশের কনসাল হল তা হলে ?

গুকুগুকুর।

কী বললে ?

গুকুগুকুর।

সেটা কোথায়?

ইন্ডিয়ান ওসানের মধ্যে একটা সর্ষেদানার মতো দ্বীপ। ম্যাপেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু তার কনসাল হতেই কি কম কাঠ-খড় পোড়ালো! কম খরচ করলো!

সত্যি ভাবা যায় না! আমাদের গদাই কনসাল হয়েছে।

তারপর বললাম, কী হবে? গদাই সুতানুটি ক্লাবের কমিটি মেম্বার হলে? ক্লাবের কমিটি মেম্বার হওয়া কি কনসাল হওয়ার চেয়েও বড় কিছু হওয়া?

আমি সত্যিই পচা কেরানি ছিলাম এবং থাকব।

আমার প্রশ্নটা এমনই শোনালো নিজের কানেই, যেন আমার জিজ্ঞাসা, সুতানুটি ক্লাবের কমিটি মেম্বার হলে কি লেজ গজাবে?

প্রশ্নটা করেই লজ্জিত হলাম।

কী আবার হবে!

হাসি বলল।

ইগো স্যাটিসফাইড হবে। টাকা হলে, মানুষ সমাজের কেউ-কেটা হতে চায়। ক্ষমতাবান হতে চায়। দশজনের একজন হতে চায়। সোশ্যাল ক্লাইমবিং করে।

মাউন্ট এভারেস্ট থাকতে হাতের কাছেই, এতো সামান্য উচ্চাশা কেন? মানে, উদ্দেশ্যটা যদি ক্লাইমবিংই হয়।

হাসি জোরে হেসে উঠে বলল, ভালই বলেছেন।

আমি বললাম, তারপর?

তারপর ধীরে ধীরে আরও উপরে উঠবে।

আমি স্বগতোক্তির মতো বললাম, আরও উপরে!

হাসি বলল, অবুদা আজকাল "ইনডিভিজুয়াল," ইনডিভিজুয়ালিটি" বলে তো কোনও কথা আর নেই। সব জায়গাতেই "দল" হয়ে গেছে। মানুষও জানোয়ারদের মতো দলে থাকে। দলে ভাবে। দেশের রাজনীতিও এরকমই। যে-কোনও ক্লাবেরই রাজনীতি নজর করে দেখলেই দেশের রাজনীতির চেহারাটি বোঝা যায়। কোনওই তফাত নেই। সর্বক্ষেত্রেই এখন ভালমানুষেরা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা হারিয়ে যাচ্ছেন। কোয়ানটিটি কাঁচা কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে কোয়ালিটিকে। এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই সামাজিক, রাজনীতিক, পারিবারিক; (বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়িতেও) "টাই-আপস"-এর দিন।

কথাটা বলতে বলতে হাসির মুখটা কালো হয়ে উঠল।

বুঝতে পারলাম যে, মানুষ হিসেবে ও ভীষণরকম আলাদা বলেই এই কষ্ট ওর। এতো কষ্ট।

আপনার বন্ধু যে দলের সঙ্গে টাই-আপ করবে তারা পরপর কয়েকবছর জিততে পারলে এক সময়ে ও ক্লাবের প্রেসিডেন্টও হতে পারে।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হলে কী হবে?

আবারও বোধহয় আমার প্রশ্নটা লেজ গজাবে কি-না-র মতো হয়ে গেল।

হাসি, হেসে বলল, জানি না।

সম্মান প্রতিপত্তি বাড়বে?

হয়তো। "যস্মিন ভাবনা যস্য, সিদ্ধিং লভতি তাদৃশীঃ"।

তারপর বলল, সম্ভবত বাড়বে। ক্লাবের দোতলাতে ওঠার সিঁড়ির দেওয়ালে আপনার বন্ধু গদাই-এর ফোটো ঝুলবে, হাসি-হাসি মুখে, হয় স্যুট-টাইপরা, নয় 'বো' লাগানো। হয়তো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছবিও ঝুলতে পারে। ন্যাশনাল ড্রেস।

উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, তাই?

হ্যাঁ। আসলে, একেকজন মানুষের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংজ্ঞা একেক রকম। নানা রকমের মানুষ বাস করে এই পৃথিবীতে। জানি না, পৃথিবীটা হয়তো তাই এখনও এতোখানি ইন্টারেস্টিং আছে। সকলেই একই রকম হলে ভারী বোরিং হতো।

চিড়িয়াখানার মতো ইন্টারেস্টিং বলছ?

হাসি হেসে বলল, তাইই।

তা তুমি কি করো? অতিথিরা যখন তোমার বাড়িতে আসেন?

বাড়ি আমার নয় অবুদা। বাড়ি অশেষবাবুরই। আমার কিছুই নয়। আমার ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করাতে হবে। বেয়ারা-ড্রাইভারদের ভাল লিভারিজ ধোপাবাড়ি থেকে আনাতে হবে, ফুল সাজাতে হবে, প্রমাণ করতে হবে যে, আপনার বন্ধু গদাই মোটেই একজন সাধারণ মানুষ নন। বড়লোকই শুধু নন, সুরুচিসম্পন্নও বটেন।

তা তুমি যাবে না ডিনারে, তাজ বেঙ্গলে?

না গেলে কী উপায় আছে? যেতেই হবে। ইংরেজি বলতে হবে শিকাগোর এরিক জনস্টন আর তাঁর স্ত্রী মারীর সঙ্গে। চিড়িয়াখানার কোন স্পেসিস-এর মতো তাঁরা দেখতে হবেন কে জানে! সকলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে হবে। সেদিন সকালে গ্রান্ড-এ বার্বার

শপে ডি-ওয়াক্সিং করতে হবে, পেডিকিওর, ফেসাল, হেয়ার-ডু।

তোমার এ-সব ভাল লাগে ?

ভালই যদি লাগবে, তা হলে আপনার সঙ্গে এখানে পালিয়ে এলাম কেন ?

পার্টি কি এই শুক্রবারেই নাকি ?

হ্যাঁ। কী শুনলেন তবে ?

মানে, পরশু ? নার্ভাস গলাতে বললাম আমি।

পরশুই তো এগারো তারিখ হচ্ছে।

সর্বনাশ ! তাহলে ?

তা হলে কী। এই শুক্রবারেই তুলকালাম কাণ্ড হবে। আমি অশেষ বোস-এর কেনা বাঁদী তো বটেই ? আদৌ কেউই নই এই কথাটা ওর বোঝা দরকার। হাই-টাইম।

এই রে ! আমাকে তুমি এর মধ্যে জড়ালে ! ও তো আমাকে মার্ডারও করে দিতে পারে। বড়লোকেরা সব পারে।

গরিবেরাও পারে। আপনি চিরদিনই অমানুষ ছিলেন। জীবনে মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ দেবো আমি আপনাকে। আপনার কোনও ভয় নেই। ইচ্ছে করলে এই ট্রেনেই ফিরে যেতে পারেন। রাতেও গাড়ি আছে। দ্যা চয়েস ইজ ইওর্স !

চমকে উঠে আমি হাসির মুখে তাকালাম। মনে হল ওর দু' চোখ ভিজে উঠেছে। কী দেখলাম কে জানে ! জল না আগুন !

আমরা পাশাপাশি চেয়ারে বসেছিলাম, এ.সি. চেয়ারকারে। পাশে থাকলে, অন্যর কাছে থাকা যায় অবশ্যই কিন্তু দেখা যায় না ভাল করে অন্যকে। পাশে থাকা মানেই যে কাছে থাকা, এমন নয়।

ট্রেনটা এবারে একেবারে থেমেছে। এই ট্রেনই আবার ফিরে যাবে কলকাতাতে। কলকাতার যাত্রীরাও অনেকেই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের নামার আগেই তাঁদের ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে দেখে এখানের বাসিন্দারা সকলেই যে সংস্কৃতিসম্পন্ন এমন মনে হল না। খুব মেঘ জমেছে। এখুনি বৃষ্টি নামবে। আমরা তাড়াতাড়ি না নামলে ওঁরা ভিজে যাবেন।

ছোট ব্যাগটি হাতে নিয়ে হাসির পেছন পেছন প্লাটফর্মে নামতেই একই সঙ্গে তিনজন মহিলা এবং দু'জন পুরুষ বলে উঠলেন, হাসি ! মিসেস বোস। মিঃ বোস আসেনি ? ক'দিনের জন্যে ?

হাসি, কারও প্রশ্নেরই জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে আমাকে নিয়ে প্লাটফর্মের সিঁড়ি উঠতে লাগলো।

শান্তিনিকেতন স্টেশানের সিঁড়িগুলো মন্দিরের সিঁড়ির মতো। কী জানি! এ কোন তীর্থযাত্রাতে নিয়ে এলো আমাকে হাসি। সিঁড়ি উঠতে যেন হাঁফিয়ে গেলাম আমি। ওঠাটা সব সময়েই কষ্টের, নামাটা চিরদিনই সোজা।

আমি বললাম, পুরো কলকাতাতে খবরটা ছড়িয়ে যাবে।

হাসি বলল, শান্তিনিকেতনেও যাবে। শান্তিনিকেতনের সমাজও শরৎবাবুর পল্লীসমাজের দিনের চেয়ে খুব বেশি উন্নত হয়নি। সংস্কৃতিসম্পন্ন, সাহিত্য-সংগীত-নৃত্য-চিত্রকলা বিশারদদের অন্তর্জগতের চেহারাটা আমার খুব ভাল করেই জানা আছে।

তবে! কী হবে?

আবারও বললাম।

ও হেসে বলল, আপনাদের স্কুলে আমাকে একবার নিয়ে যাবেন তো কলকাতা ফেরার পরে। স্কুলটা ছেলেদের না মেয়েদের খুব জানতে ইচ্ছে করে আমার। আপনারা এক-একটি চিজ! সত্যি! সেদিন সল্ট লেকে আপনাদের ওল্ড বয়েজ রিইউনিয়নে না গেলে, আপনাদের প্রজাতিকে অমন করে জানা হতো না। অবশ্য এও ঠিক যে, আমার অবুদার সঙ্গে দেখা তো হয়তো হতো না সেখানে না গেলে। তবে, মনে হয়, একটাই ভুল করেছিলেন গুটলুবাবু।

কী? মানে, কোনটা?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

রিইউনিয়নটা সল্ট লেকে ঝাবুবাবুর শ্বশুরবাড়িতে না করে চিড়িয়াখানাতেই করা উচিত ছিল। সেদিন না বলেছিলেন, চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটর সুশান্তবাবুকে আপনি চেনেন!

দু'পাশ দিয়ে সাইকেল রিকশা চলেছে ক্রিং ক্রিং করতে করতে। আমি চলেছি আমার হতে-পারতো-বউ হাসির পাশে বসে সাদা মারুতিতে।

মারুতি-টারুতির কোনওই দরকার ছিল না। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যদি কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়ার বা অন্য কোনও পাড়ার ছায়া-ঢাকা পথ দিয়ে হাসির পাশে বসে সাইকেল রিকশা করেও যেতে পারতাম! ভাবছিলাম যে মানুষের জীবনে একই ঘটনা আগে আর পরে ঘটলে কত অন্য রকম লাগে। ভাল লাগা খারাপ লাগাটা ঠিকই থাকে, কিন্তু রকমটা, অনুভূতির গভীরতাটা কত বদলে যায়।

তবু, এখনও স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। এই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার পেছনে সবটুকু কৃতিত্ব গুটলুরই। তবে, গুটলু আমার শান্তিনিকেতনে আসার কথাটা জানে না। জানলে, হয়তো ভাল মনে নিতো না। তবে স্কুলের বন্ধু গদাই-এর সঙ্গে এবং হাসির সঙ্গে তো বটেই এবং আরও অনেক বাল্যের বন্ধুদের সঙ্গে এতো দীর্ঘদিন পরে দেখা হওয়ার পেছনে তো গুটলুই। শুধুমাত্র গুটলু। না দেখা হলে একটা পরম সত্য অজানাই থাকতো। সেই সরল সত্যটা এই যে, বাল্যের বন্ধু আর বাল্য-বন্ধু এই দুটি কথাতে তফাত আছে।

গাড়িটা ফাঁকাতে চলে এলো।

হাসি আমাকে বলল, আমরা পূর্বপল্লীতে যাব।

আশ্রমটা কোনদিকে ?

শান্তিনিকেতনে জীবনে প্রথমবার-আসা আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

দেখবেন, দেখবেন। আছেন তো তিনদিন ! এখন চলুন, হাত মুখ ধুয়ে খাবেন আগে।

হাসি বলল।

তারপরই হঠাৎ বলল, আমার হাতের উপরে হাত রেখে, আপনার ভাল লাগছে ? অবুদা ?

কী বলব। কেমন করে যে বলব ? অনেক সময়ে কথার চেয়ে নীরবতা অনেক বেশি বাঙ্ময় হয়। আমি চুপ করে হাসির হাতটি আমার হাতে ধরে রইলাম ! বাহান্ন বছরের পচে-যাওয়া পচার শরীরে যেন হাজার হাজার সবুজ গাছের চারা বেরোল।

হাসি বলল, স্বগতোক্তির মতো, আগামী কাল বাইশে শ্রাবণ। শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব হবে কাল।

আরও কিছুটা এগিয়ে গেল সাদা মারুতি। দু ধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ি।

হাসি হঠাৎই ডান হাতটি তুলে বলল, এ যে অশেষবাবুর বাড়ি। মানে, আপনার বন্ধু গদাই-এর।

বললাম, বাবা ! এ যে প্যালেস ! শান্তিনিকেতন না কি আশ্রম !

রবীন্দ্রনাথ তো আশ্রমই গড়েছিলেন, পিতৃদেব যে এক ছাতিমতলাতে পাল্কি থামিয়ে জিরিয়েছিলেন শান্তিতে সেই এলাকার চারপাশ ঘিরেই শান্তিনিকেতন। উনি তো শিব গড়তেই চেয়েছিলেন। গড়েওছিলেন। নবাগন্তুকদের হাতে পড়ে তা এখন বাঁদর হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

গাড়ি ঢুকলো ভিতরে। দেখলাম, চমৎকার বাগান, বাড়িটির চারদিকে। ছোট ছোট ফুল গাছ নয়। বড় বড় গাছ। মনে হয় যেন পুরনো দিনের কোনও আশ্রমে এসেছি আশ্রমবালিকার হাত ধরে। বাড়িটির বিরাটত্বর দোষ অনেকখানিই কেটে গেছে তার পরিবেশের সৌন্দর্যে।

বাগান কি আগেই ছিল ? চমৎকার কিন্তু। তুমিই করেছ ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কিছু কিছু গাছ আগেই ছিল। শিমুল, অগ্নিশিখা, কাঁঠালচাঁপা, বাতাবি লেবু। বাঁশঝাড় আমিই লাগিয়েছি। দেখেছেন কেমন সরু সরু। মধ্যপ্রদেশের অচানকমারের জঙ্গল থেকে আনিয়েছিলাম। জ্যাকারান্ডাও আমি লাগিয়েছি। এককোণে পলাশের জঙ্গল করেছি। এমনই বাড় এদের যে যত্ন তো করতে হয়ই না উল্টে কাটতে হয় কিছু প্রতিবছরই। ভারতের জনসংখ্যার হারেরই মতো এদের বাড়। কিন্তু আশ্চর্য ! মানুষ এমনই সর্বভূক, সর্বগ্রাসী হয়েছে যে, তার রান্নার জ্বালানী এবং বাড়ি করার জমির জন্যে সবই কাটা হয়। এমনই অবস্থা যে এখন এই শান্তিনিকেতনের আশে পাশেও পলাশ কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়। বস্তি, ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে একবার এসেছিলাম উনিশশ পঁয়ষট্টিতে—তখন আমার কী বা বয়স ! তখনও কী সুন্দর ছিল।

কত জমি আছে ? তোমাদের বাড়িতে ?

দু' বিঘা। পূর্বপল্লীর অরিজিনাল সব বাড়িই ছিল দু' বিঘা জমির উপরে। মানে, বাগানটাই ছিল মুখ্য। বাড়িটা গৌণ।

বাড়িতে ঢুকে আমার ঘর, অর্থাৎ গেস্টরুম দেখিয়ে দিলো হাসি।

বলল, বাথরুমে তেল, সাবান, তোয়ালে, বাথরুম-স্লিপার সব রাখা আছে। হাত মুখ ধুয়ে আসুন, আমি খাবার ঘরের দিকে যাচ্ছি—খাবার লাগাতে বলি। এই ছেলেটি, এর নাম রতন, আপনাকে নিয়ে আসবে খাবার ঘরে।

বাথরুমে ঢুকে মনে হল আছাড় খেয়ে পড়েই প্রাণটি যাবে। সাদা মার্বল-এর উপরে জল পড়ে থাকলে দেখা যায় না। জল অবশ্য পড়ে নেই, ঝকঝকে শুকনো করে মোছা। বাথটাব লাগানো ! এও আর এক বিপদ। জন্মে তো বাথটাবে চান করিনি। আহিরীটোলার ঘাটে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলাতে যেমন শুশুক দেখতাম গুবক-গাবুক করে জলে ডুবছে আর ভাসছে, তেমন করেই শুশুক হয়ে গিয়ে চান করতে হবে হয়তো বাথটাব-এ।

দূর থেকে বড়লোকেরা দেখতে ভাল, তাদের জীবন যে পদে পদে এতো বিপজ্জনক তা কি আগে জানা ছিল ?

সত্যি ! আমাদের ছেলেবেলা কলকাতাতে কত কী-ই ছিল ! আজ আর সেসব কিছুই নেই। গঙ্গাতে তখন শুশুক ছিল কত। বর্ষার আগে চাতক পাখিরা দল বেঁধে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে লাহাদের বাগানের নিমগাছটিকে প্রদক্ষিণ করে ডাকত। মা বলতেন, দ্যাখ পচা, শোন, ওরা বলছে : "ফটিক জল, ফটিক জল"। বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির পরে, ঘোষেদের বাগানে জল জমে যেতো, আমরা দোতলার বারান্দা থেকে দেখতাম বড় বড় হলুদ ব্যাঙ—শ'য়ে শ'য়ে একসঙ্গে গলা ফুলিয়ে ডাকছে। মসুর ডালের খিচুড়ির আর আলুভাজার গন্ধের সঙ্গে ওই হলুদ বা সোনা-ব্যাঙেদের ডাক আমার স্মৃতিতে একই ফ্রেমে বাঁধান আছে চিরদিনের মতো। গন্ধ নাড়ালেই শব্দও নড়ে।

ভারি ভাল জায়গা শান্তিনিকেতন। আগে হয়তো আরও ভাল ছিল। আমি তো আগে আসিনি।

বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। কত গাছগাছালি। গাছেদের নাম আমি জানি না। ছেলেবেলায় তাও যা দু-একটা শিখেছিলাম, ভুলে গেছি। হাসিব কাছ থেকে শিখতে হবে।

শান্তিনিকেতনে আসা, হাসির সঙ্গে পুনর্মিলন, মানে দেখা হওয়া, সে তো হারিয়েই গেছিল আমার জীবন থেকে চিরদিনের মতো। এ সবই গুটলুরই জন্যে।

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ধুতে ধুতে পেছনে হেঁটে গেল মন। মনের গতি কত, তা কে জানে ! আলোর গতি তো সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তার কতগুণ বেশি মনের গতি—সামনে বা পেছনে, কে জানে তা !

॥ ২ ॥

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই আমার ভাইপো রাজু বলল, ছোটকা তোমার বন্ধু গুটলুকাকু এসেছিলেন।

অবাক হয়ে বললাম, তুই গুটলুকে চিনিস নাকি ?

চিনি না মানে ! সেই যে একদিন তোমার সঙ্গে সল্ট লেকে যাচ্ছিলাম না ডাইনোসর দেখতে, তখন রাস্তায় দেখা হল না ? গুটলুকাকু তাঁর ভাইঝিকে নিয়ে সেখানে এসেছিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো ! আমার মনেই ছিল না ।

তারপর বললাম, তুই চিনিস না বটে কিন্তু মুকু আর বাঁটুল চেনে। ওদের নিয়ে যখন পুরীতে গেছিলাম তখন গুটলুও গেছিল পুরীতে ।

তাই ?

রাজু বলল। অবাক হয়ে।

হ্যাঁ রে। তা কী বলল গুটলু ?

বলল, তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকার। গুটলুকাকুর টেলিফোন খারাপ। তাই নিজে বাড়িতে এসেছিলেন। তুমি যেভাবেই হোক, গুটলুকাকুর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। কালই। আর আগামী সপ্তাহের শুক্রবার রাতে কোনও কাজ রেখো না, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। গুটলুকাকু বলেছেন।

ও।

আমি বললাম।

একটু আশ্চর্যই হলাম।

গুটলু, মানে, আমার স্কুলের বন্ধু। ভাল নাম গুণেনচন্দ্র পাইন। তার সঙ্গে আজকে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না প্রায় বছর কুড়ি। মাঝে একবার দেখা হয়েছিল বছরখানেক আগে এবং বেশ ক'দিন একসঙ্গে কাটানো গেছিল পুরীতে। আমি উঠেছিলাম পুরী হোটেলে। গুটলুও তার ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে উঠেছিল গিয়ে পুরী হোটেলেই। কিছুদিন আগে অবশ্য সল্ট লেক-এ ডাইনোসর দেখতে গিয়ে দেখা হয়ে গেছিল। ঠিকই বলেছে রাজু।

ভাবছিলাম যে, স্কুলও তো আমরা ছেড়েছি বহু বছর হয়ে গেল। স্কুলের বন্ধু গুটলুর সঙ্গে আমার প্রধান মিল ছিল এইটুকুই যে, গুটলুও ব্যাচেলর, আমিও ব্যাচেলর। তবে, অমিলও কম নেই।

ব্যাচেলর হলে কি হয়, নিজেদের সংসার নাই বা থাকল, তবু আমাদের দুজনকেই সংসারের বোঝা বইতে হয়। তবে শুধু বোঝাই বলব না, সংসারের মধ্যে থাকলে নিজের সংসারই হোক, কী অন্যের সংসার, আনন্দও কিছু থাকে, কিছু প্রাপ্তি ; এবং যৌথ পরিবারে থাকার যে আনন্দ সে আনন্দর গভীরতা যাঁরা "একলা হাতে একলা পাতে খাইতে বড় সুখ" এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁরা হয়তো জানেনও না।

জানেন না বলব না, আজকাল অনেকেই হয়তো হাড়ে হাড়ে জানছেন। যাঁরাই আলাদা থাকাই সুখের উৎকর্ষ বলে একসময়ে মনে করেছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে অনেকেই "পুনর্মূষিক ভবঃ" এই প্রবাদের কথা, পস্তাতে পস্তাতে একেবারেই মনে যে করেন না, এ-কথা বলা

যায় না।

ভেবে পেলাম না যে, কী এমন দরকার থাকতে পারে গুটলুর যে, এতোবছর পরে বাড়ি বয়ে আমার কাছে এল জরুরি তলব করতে।

পরের দিনই অফিস-ফেরতা গেলাম গুটলুর কাছে।

গুটলু ভাগ্যবান। একসময়ে ওদের মস্তবড় পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ছিল। পার্টনারশিপ ফার্ম কিন্তু হরেকরকম ব্যবসা ছিল ওই ফার্মের নামে। ফার্মের নাম ছিল, পাইন অ্যান্ড পাইন। বাবা-কাকারা সকলে মিলে প্রায় জনা পনেরো। তবে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে বাঙালিদেব প্রায় প্রতি সচ্ছল পরিবারেই, ওদের পবিবারেও তাই ঘটেছিল। ঠাকুরদা গত হওয়ার পরে পরেই ব্যবসা ভেঙে কাচের বাসনের মতো টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল।

প্রকাণ্ড বড় এজমালি বাড়ি। তাতেও পার্টিশান হয়েছে।

কোনও কাকার অবস্থা দারুণ ভাল। কোনও জ্যাঠার অবস্থা ভীষণ খারাপ। প্রাসাদোপম বাড়ির কোনও অংশের দেওয়ালে নীল রং, কোনও অংশের দেওয়ালে লাল। কারও বারান্দার রেলিংযে ভেলভেটের ওয়ার-পরানো লেপ ঝোলে শীতের রোদ্দুরে, কারও বারান্দার রেলিং থেকে ছেঁড়া শাড়ি, বিবর্ণ গামছা, ফেটে যাওয়া লুঙি। কারও ঘর থেকে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান ভেসে আসে, কারও ঘর থেকে এইচ.এম.ভি. এফ. এম-এর ; কারও ঘর থেকে-বা ভীমসেন যোশীর ভজন "যো ভজে হরিকো সদা।"

দূর থেকে ওদের বাড়ির দিকে আজকাল তাকালেই বাড়ির বাসিন্দাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা যায় এবং সেই বৈচিত্র্যের কারণ বুঝতেও তেমন কিছু বুদ্ধিরও দরকার হয় না।

আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন ওই বাড়ির চেহারাটাই ছিল অন্যরকম।

সাচ্ছল্যর একটা আলাদা জেল্লা আছে। সেই জেল্লা অন্দরের মানুষদের যেমন উজ্জ্বল করে, বাইরের মানুষদেরও ঔজ্জ্বল্য ধার দেয় সাময়িকভাবে। দূর থেকে, নদীর গন্ধেরই মতো, স্বাচ্ছন্দ্যর গন্ধ পাওয়া যায়, যেমন দারিদ্র্যরও গন্ধ। ছেলেবেলায় বুঝতে পারতাম না। এখন বুঝি।

তবে আনন্দের কথা এইটুকুই, যতটুকু শুনেছিলাম গুটলুর কাছে, পুরীতে ; যে ওদের অংশে, মানে, ওর বাবার পরিবারের মধ্যে এখনও ভাগাভাগি হয়নি। বাবা ও আপন কাকারা সবাই-ই সেই প্রাচীন বিরাট অট্টালিকার এক প্রান্তে কয়েকটি ঘর নিয়ে একই সঙ্গে থাকেন।

উনুন আলাদা হয়নি এখনও।

গুটলু একতলাতে, যেখানে আগে গারাজ ও আস্তাবলও ছিল ; তারই একাংশে একটি মুদির দোকান দিয়েছে। মুদির দোকান ঠিক নয়, স্টেশনারি দোকান।

এ-বাড়ির সকলেই যদি গুটলুর দোকান থেকেই সব জিনিস কিনতেন তা হলেই সে বড়লোক হয়ে যেত। কিন্তু পাইন পরিবারের মানুষদের কেউই প্রায় কিছুই কেনেন না সেখান থেকে। তাঁরা যান মোড়ের হরি মারোয়াড়ির দোকানে। আর বাঙালি ও অবাঙালি প্রতিবেশীরা জিনিস কিনতে আসেন দূর থেকে তার দোকানে। বাঙালির মতো এমন আশ্চর্য জাত বিধাতা বোধহয় এ-পৃথিবীতে বেশি সৃষ্টি করেননি। পিরানহা মাছেদেরই মতো, নিজেদেরই খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। তবে এইভাবে আর কতদিন বাঁচতে পারব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

দুটি অল্পবয়সী কর্মচারি আছে। তারাই দোকান দেখাশোনা করে। গুটলু ব্যবসা-ব্যবসা খেলা করে। পাছে, বসে থাকলে হাতে-পায়ে বাত হয়, সেজন্যেই সম্ভবত এই খেলা নিয়ে আছে। ওর ঠাকুরদার অনেকই কোম্পানির কাগজ, জমি-জমা, মাছের ভেড়ি, গয়নাগাটি, নগদ এবং আরও নানারকমের সম্পত্তি ছিল। পূর্ব-পুরুষের ওইসব সম্পত্তি বসে-খাওয়া মনোবৃত্তির বাঙালিদের বহু প্রজন্মকেই যেমন একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে, গুটলুদের পরিবারকেও দিয়েছে। বসে-খাওয়ার প্রবণতা বাড়িয়েছে একদিকে আর অন্যদিকে শ্রম, মানসিক অথবা কায়িক শ্রম, যে মনুষ্যত্বর একটি বিশেষ উপাদান সেকথা বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছে।

গুটলু পরমানন্দে থাকে, তার ভাইপো-ভাইঝিদের কোলে-কাঁখে নিয়ে। এখনও মোহনবাগানের অন্ধ সাপোর্টার। প্রতিটি ম্যাচ দেখতে যায়। ফুটবল ম্যাচ অবশ্য।

পুরীতে ওকে বলেছিলাম, তোর মোহনবাগানে তো বাঙালি ছেলেরাই খেলে না। তোরা তো দেশ-বিদেশ থেকে খেলোয়াড় ধরে এনে টিম বোঝাই করেছিস, বাঙালির মোহনবাগানের ঐতিহ্য আর রইল কোথায় ?

গুটলু দমেনি। বলেছিল, মোহনবাগান লেন তো আছে। ফুটবলে কোন মক্কেলে লাথি মারল না মারল তাতে কি গেল এল ?

গুটলুর দোকানে পৌঁছে দেখলাম, সে দোকানে নেই। যথারীতি।

যে ছেলে দুটি দোকান দেখে, তারা আমাকে চেনে না। তবে নাম বলতেই চিনল। বলল, গুটলুদা বলে গেছেন আপনার কথা কিন্তু উনি গেছেন ঝাবুবাবুর বাড়িতে। সল্ট লেকে। আপনাকে বলে দিতে বলেছেন যে, তাঁরই বাড়িতে, মানে ঝাবুবাবুর শ্বশুরবাড়িতে আপনাদের স্কুলের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আসবার কথা আছে আগামী সপ্তাহের শুক্রবার। সারাদিন সেখানে খাওয়া দাওয়া, গল্প-আড্ডা হবে। মানে, যাকে রিইউনিয়ন বলে আর কী!

ঝাবু এল কবে আমেরিকা থেকে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তা তো আমরা জানি না।

বললাম, শুক্রবারে তো আমার অফিস। গুটলুকে বলবেন যদি অসম্ভব না হয়, তবে ওই দিনটি পালটে শুক্রবার থেকে শনি অথবা রবিবার করতে পারে। তবেই আমার পক্ষে সকাল থেকে সেখানে থাকা সম্ভব হবে। নইলে পারব না।

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, ফোন কি এখনও ঠিক হয়নি?

আজ্ঞে না।

তা হলেও ওকে দয়া করে বলবেন যেন আমার অফিসে অথবা বাড়িতে অন্য কোথা থেকেও একটা ফোন অবশ্যই করে দেয়। কারণ, আমার অফিস থেকে এদিকে আসতে একেবারে উল্টোমুখে আসতে হয়। তারপরে ট্রামে-বাসে বাড়িমুখো যাওয়া প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার।

ছেলে দুটি হাসিখুশি। ভাল। দোকানে বেশ ভিড়ও আছে দেখলাম। তারাই হাসিমুখে দৌড়োদৌড়ি করে সামলাচ্ছে সব। বলল, নিশ্চয়ই বলে দেব আমরা। হয়তো গুটলুদা আগামীকালই আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবেন।

গুটলুদের বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই জোর বৃষ্টি নামল। ওদের বাড়ি থেকে শ-দুয়েক গজ দূরে একটি বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নিচে মাথা বাঁচানোর জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাড়ি-বারান্দাওয়ালা বাড়িটিরই দোতলাতে একটি মেয়ে তানপুরা বাজিয়ে গান গাইছে। ভারি চমৎকার সুরে-বসা গলা।

গান, আজকাল অনেকেই গাইছেন। বলতে গেলে, গায়কের সংখ্যা শ্রোতার সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে কিন্তু খুব কম গায়ক-গায়িকার গলাই সুরে বলে। হয় সুর কম লাগে, নয় স্বর নড়ে

যায়। সেসব গান শোনা আদৌ আনন্দের ব্যাপার নয়। সেই সব গান শুনলে দুঃখ, দুঃখও বলব না ; বলব উত্তেজনা, রক্তচাপ বৃদ্ধিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাঁদের কানে সুর আছে একমাত্র তাঁরাই এই সব দুঃখ-কষ্টের কথা জানেন। অন্যেরা বেঁচে যান।

বৃষ্টির জন্যে এখন রাস্তাতে লোকজনও একেবারেই নেই। দু-একটি গাড়ি যাচ্ছে, তাও অনেকক্ষণ পর-পর। আমার পাশেই বেলফুলওয়ালা বেলফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গন্ধে ম' ম' করছে চারপাশ। উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে দক্ষিণ কলকাতার মতো উঠতি বড়লোকের এবং আপস্টার্টদের ভিড় নেই। গাড়িটাড়িও কম। দু-একটি পর্দা-টানা রিকশার টুং-টাং শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া বৃষ্টির একটানা শব্দ। বৃষ্টির শব্দ যেন অনেকগুলো জোড়া তানপুরার কাজ করছে। বৃষ্টির ঝমঝমানিও যেন সি শার্প-এ বেঁধে দিয়েছেন কোনও অদৃশ্য গুরু এবং মেয়েটির নিজের তানপুরাও বাঁধা রয়েছে সি শার্প-এই। দুর্গা রাগে গাইছে মেয়েটি। এবং ভারি চমৎকার গাইছে।

মেজাজ খুশ হয়ে গেল সারাদিন অফিসের খাটনির পরে।

কিছুদিন আগেই পদ্মা তলোয়ারকর-এর মুখে এই রাগটি শুনেছিলাম বালিগঞ্জের এক পরিচিত রহিস আদমির বাড়িতে। সেই বন্ধু আমারই মতো গান-বাজনা পাগল। তবে তাঁর সঙ্গে আমার তফাত হল এই যে, তাঁর খাতিরদারি করার, গুণিজনকে ইজ্জত দেবার সামর্থ্য আছে। আর আমার যোগ্যতা শুধুই ভাললাগার। ভাললাগাই আমার একমাত্র যোগ্যতা।

ভারতবর্ষের এমন কোনও ওস্তাদ এবং পণ্ডিত গাইয়ে-বাজিয়ে নেই, যিনি ভন্টু চাটুজ্যের বাড়িতে বা তাঁর শ্বশুর বাড়িতে কখনও-না-কখনও গেয়েছেন বা বাজিয়েছেন। এ-ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আনন্দবাজারের সরকারদের মিল আছে। অশোকবাবু এবং তাঁর মেজ ছেলে গায়ক-বাদকদের মস্ত গুণগ্রাহী। এই কারণেই ভন্টুকে আমি ঠাট্টা করে ডাকি মন্মথবাবু বলে। মন্মথবাবু মানে, এ-সব ব্যাপারে উত্তর কলকাতার, মস্ত গুণগ্রাহী পাথুরেঘাটার পরলোকগত মন্মথনাথ ঘোষ।

বৃষ্টির মধ্যে সেই গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে, অচেনা-অদেখা অল্পবয়সী মেয়েটির চিকন গলাতে 'দুর্গা' শুনতে শুনতে ভাবছিলাম যে, সত্যিই মানুষের জীবনে সুযোগ এবং পরিবেশ কত বড় ব্যাপার! এই নাম-না-জানা মেয়েটি, এই অশেষ সরকার লেনের গলির এই

জরাজীর্ণ বাড়ির, সম্ভবত কোনও সাধারণ অবস্থার পরিবারের মেয়ে না হয়ে, যদি বোম্বের বা বরোদার বা ভূপালের বা লক্ষ্ণৌর এমনকি পাটনারও কোনও অবস্থাপন্ন সুরুচি-সম্পন্ন গান-বাজনা-ভালবাসা মানুষের ঘরে জন্মাত, সে-ও হয়তো একদিন পদ্মা তলোয়ারকর হতে পারত।

ভাবলে, আমার একধরনের উষ্মা হয় যে, নিজেদের কোনও চেষ্টা ব্যতিরেকেই, শুধুমাত্র পরিবারের পরিচয়ে অথবা গুণেই কত মানুষ জীবনে কত হ্যান্ডিকাপ পেয়ে যান, তিনি ব্যবসায়ী হোন কি অধ্যাপক, খেলোয়াড়রই হোন কি সঙ্গীতজ্ঞ। এই ব্যাপারটাই আমাকে বড় ব্যথিত করে। "বনেদিয়ানা" নিয়ে অনেকেরই যেমন গর্ব আছে তেমন তাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, বনেদিয়ানার মধ্যে এক ধরনের লজ্জাও অবশ্যই আছে। থাকা উচিত অন্তত।

যা-কিছুই মানুষে নিজগুণে, নিজ চেষ্টাতে, নিজ পরিশ্রমে অর্জন না করে, তা নিয়ে তার নিজস্ব কোনও গর্ব থাকা আদৌ উচিত নয়। "সম্ভ্রান্ততা" শুধুমাত্র ব্যবহারের, সৌজন্যের এবং বিনয়ের ক্ষেত্রেই দাবি করাটা ন্যায্য। অর্থ, যশ, ক্ষমতা এ-সব ক্ষেত্রের "বনেদিয়ানা" নিয়ে একজন সুস্থ ও সৎ মানুষের লজ্জিতই থাকার কথা।

এই যে অসাম্য, সম্পূর্ণ বিনাদোষে, তাদের সমস্তরকম গুণ থাকা সত্ত্বেও অগণ্য মানুষেরা যে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-সাঙ্গীতিক এবং খেলাধুলোর জগতেরও পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে পারে না এর জন্যে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। কিছু মানুষের কাছে সবরকম সুযোগের দরজা খোলা আর অধিকাংশ মানুষের কাছেই তা বন্ধ। এটা অন্যায়, ভীষণই অন্যায়।

এই সব তাৎক্ষণিক বড় ভাবনার পিছনে কিন্তু আমার কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। কারণ, আমি তো গুটলুরই মতো অকৃতদার। কিন্তু নিজের রক্তজাত সন্তান না থাকলেও, আমারও ভাইপো-ভাইঝিদের প্রতি দরদ তাদের মা-বাবার চাইতে কিছুমাত্রই কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বেশিও। তবে জানি না, ইংরেজিতে একটা কথা আছে : "Blood is thicker than water" তাই আমি যখন বৃদ্ধ অশক্ত হব, তখন তাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক থাকলেও, তারা কি আর তাদের মা-বাবাকে যেমনভাবে দেখবে, তেমনভাবে আমাকেও দেখবে?

জানি না, মৃত্যুর সময়ে হয়তো একা ঘরে, অন্ধকারে, বিনা-শুশ্রূষায়, বিনা চিকিৎসায়, মুখে একটু জল দেওয়ার জন্যে কোনও মানুষের

অপেক্ষাতে, শুকনো গলায় শেষ নিশ্বাস ফেলতে হবে।

যা হবে, তাই হবে। একাধিক সন্তান থাকলেও অনেকেই বাবা-মায়ের শেষ সেইভাবেই আসতে দেখছি আজকাল। এই নিয়ে আগাম দুঃখের কোনও মানে নেই। তবে, বয়স বাড়ছে বলেই মাঝে মাঝে এ-সব ভাবনা যে মনে একেবারেই আসে না, এমনও নয়। বয়স্ক, অকৃতদার যাঁরা, আমার মতো, তাঁদের সকলের মনেই হয়তো এই সব ভাবনা আসে।

সেই অচেনা-অজানা মেয়েটির গাওয়া দুর্গা রাগের মূর্ছনা, এ-পাড়ার অলি-গলি, অন্দর-কন্দর যেন বৃষ্টির মিষ্টি আমেজেরই মতো ভরে দিচ্ছিল। এখানে বৃষ্টিশেষের হাওয়াতে বাতাবি ফুলের গন্ধ নেই, কিন্তু তেলেভাজার গন্ধ আছে ; যে গন্ধও এক তীব্র আনন্দে আমার মতো অগণ্য সাধারণ মানুষের মনকে এক অন্যরকম সুখে ভরে দেয়, সেই গন্ধের সঙ্গেও, বেলফুলের গন্ধেরই মতো, যুগ-যুগান্তের কলকাতার বর্ষার স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে।

এ-কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল কী অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। কোথায় রাগ দুর্গা, কোথায় বেলফুল আর কোথায় তেলে ভাজা !

॥ ৩ ॥

গুটলুদের বাড়ি থেকে যখন ফিরলাম তখন দেখি সে-ই এসে বসে আছে আমাদের বাড়িতে। চা-চিঁড়েভাজা খাচ্ছে।

খুব লোক, যা হোক তুই !

আমি বললাম।

ভাল লোক বলেই তো সোজা ঝাবুর শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছি তোর কাছে। আমার হেভি টেনশান হচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক-ঠাক না হলে আমার শ্রাদ্ধ করবে ঝাবু।

বল, ব্যাপার কী তাই বল ?

গুটলু বলল, অনেক বছর ধরেই ইচ্ছে যে, স্কুলের অন্তত কিছু বন্ধুদের একসঙ্গে করে একটা গ্রান্ড রিইউনিয়নের বন্দোবস্ত করি। মানে যাকে বলে রিয়াল "হুজ্জোত"। অবশেষে আমি তুই ছাড়াও ছ'জন বন্ধুর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পেরেছি। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার কেউ-কেটা। কেউ-কেউ অনাবাসীও। এন.আর.আই।

তারা কে কে ? মানে, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিস ?

গদাই, সুশান্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ন্যাকা, সবুজ। এবং অবশ্যই ঝাবুও।

করেছিস কী রে? সাব্বাস! কিন্তু তুই তাদের চেহারা চিনলি কী করে? স্বপ্নে দেখেছিলি নাকি?

না রে শালা! স্বপ্নে আমি সুন্দরী মেয়ে ছাড়া কারওকেই দেখি না। ওই ষাঁড়দের স্বপ্নে দেখতে যাব কোন দুঃখে?

তারপর বলল, স্বপ্নে দেখিনি কিন্তু দু'একজনের সঙ্গে মাঝে দু'একবার এখানে ওখানে দেখা হয়েছিল।

তাই?

ইয়েস।

তা হবে।

আমি বললাম।

গুটলুর স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল চিরদিনই যে, প্রত্যেকেই আমরা ভালবাসতাম ওকে। "অজাতশত্রু" শব্দটা misnomer বলেই মনে হয় আমার।

কারণ, যে মানুষের ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান আছে তার পক্ষে কখনও অজাতশত্রু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গুটলুর বেলা ওই বিশেষণ অবশ্যই প্রয়োগ করা চলে।

বলল, ঝাবুর ওখানেই ঘটাব ওই সম্মিলন। বাড়িটা অবশ্য ঝাবুর নিজের নয়, ওর শ্বশুরের। ঝাবুর শ্বশুর, ঝাবুর বিরাট আন্তর্জাতিক ব্যবসার অংশীদারও বটেন। তাঁরই সল্ট লেকের বাড়িতে এই জমায়েতটি হতে চলেছে এবং আমার এবং অন্য কারও-কারও অনুরোধানুযায়ী ওই হুজ্জোত শুক্রবারের বদলে রবিবারেই পিছোনো হয়েছে। কিন্তু শর্ত এই যে, সকাল সাতটার মধ্যে গিয়ে সেখানে সকলেরই পৌঁছতে হবে। সকালের জলখাবারের সময় থেকে রাতের খাবার সময় অবধি সবাই সেখানে কাটাবে, স্ত্রীরাও। মানে, যাদের আছে। সকলের ছেলে-মেয়েরা এলে আনম্যানেজেবল হয়ে যাবে, তাই তাদের নাকি বাদ দেওয়া হয়েছে।

শুনে, আমার মন খারাপ হল। সন্তান সে বড়ই হোক কি ছোট, ছেলে অথবা মেয়ে, তাদের এখন আর কোনও পার্টিতেই নিয়ে যাওয়াটা রীতি নয়। বিদেশেরই মতো, বঙ্গভূমের রাজধানী কলকাতাতেও আন্ডা-বাচ্চাদের নিয়ে কোথাওই যাওয়ার চল নেই। এ-রেওয়াজটা আমার সত্যিই অত্যন্ত খারাপ লাগে। আজকে যে ছেলেমেয়েরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, একা হয়ে যাচ্ছে, ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছে, উদ্ধত হয়ে যাচ্ছে; মনে হয়, তার একটি প্রধান কারণ এই যে,

বাবা-মায়েরা সপ্তাহে গড়ে তিনদিন "পার্টি" করে বেড়াচ্ছেন বাড়িতে তাদের একা ফেলে রেখে।

সে সব কথা মনেই রইল। গুটলুকে আর বললাম না।

আমরা যখন বিয়েই করিনি, আমাদের বউয়েরও বালাই নেই; সন্তানের তো নেইই।

বউ নেই বলে দুঃখ নেই, তবে বাচ্চা নেই বলে মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, বুঝলি। অ্যাডাপ্ট করার কথা ভেবেছি কিন্তু ভাইপো-ভাইঝিদের মুখ চেয়ে তা করতে পারিনি।

গুটলু হেসে বলল, কথাটা মন্দ বলিসনি। বউ ছাড়া বাচ্চা, জমে যেত ব্যাপারটা!

গুটলুকে বললাম, এত লোক খাবেদাবে সারাদিন, তা আমাদের চাঁদা দিতে হবে তো? কত টাকা চাঁদা ধার্য করেছিস পার হেড?

গুটলু বলল, মাত্থা খারাপ! সব খরচা ঝাবুর। সে তো মস্ত বড়লোক রে এখন। "ফিলদি রিচ" যাকে বলে। "বর্বরস্য ধনক্ষয়" করা যাবে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবি না আদৌ। ওসব বললে ওর ইগোতে লাগবে। বড়লোকি দেখাবে বলেই তো ওখানে করতে চাইছে ঝাবু, নইলে আমি তো বলেইছিলাম বিজলি গ্রিলকে বলে দেব, দেবুদা সস্তাতেও করে দিতেন। কোনও ছোট হল-টল ভাড়া করে নিতাম। তা ঝাবুর প্রবল আপত্তি। তুই খালি সকাল সাতটার মধ্যে তোর বডিটা নিয়ে চলে আসবি। এসে, বডি ফেলে দিবি ঝাবুর উপরে।

এই বলে, আমাকে সল্ট লেকের ঠিকানাটা লিখিয়ে দিল। বলতে গেলে, ঠিকানাটা গুটলু, তোতাপাখির মতো মুখস্থও করিয়ে দিল। ঝাবুর শ্বশুরবাড়ির চার-চারটে টেলিফোন নম্বরও দিয়ে দিলো। বলল, যদি কোনও প্রয়োজন হয়, অথবা যদি তোর ইচ্ছে করে ঝাবুর সঙ্গে অথবা তার স্ত্রী মন্দিরার সঙ্গে রবিবারের আগে কখনও কথা বলতে, তা হলে তুই ফোনে ওদের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারিস।

বললাম, দাঁড়া দাঁড়া। আগে দেখাই হোক। তা ছাড়া ঝাবু কোনওদিনই তেমন অন্তরঙ্গ ছিল না আমার।

গুটলু বলল, শুনলাম। কিন্তু আদিখ্যেতা করতে ইচ্ছে হবে বলে মনে হল না। যদিও স্কুলের বন্ধু আমরা সকলেই কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধানে তারা তো আজকে অপরিচিতই হয়ে গেছে। আবার "ফিনসে শুরু" করতে হবে। কী লাভ? যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখার সময় নেই। সত্যিই নেই।

তাই মিছিমিছি নতুন করে এবং হয়তো গায়ের জোরেই মরে-যাওয়া বন্ধুত্বর রেজারেকশান ঘটাবার দরকারটাই বা কি ছিল গুটলুর তা জানি না। হুজ্জোতই বটে। গুটলুটা চিরদিনের হুজ্জোতবাজ।

ভাবছিলাম, কতদিন দেখিনি ঝাবুকে। জানি না, সে কতখানি বদলে গেছে। অনেকই বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমিও তো অনেকই বদলে গেছি। তা ছাড়া, সে বড়লোক বলেই, আমরা শৈশবের বন্ধুরা সকলে মিলে যে তার একার ঘাড়েই, গুটলুব কথাতে, "বড়ি ফেলে দেব" এ-কথা ভাবতেও বেশ খারাপ লাগছিল।

গুটলুর উষ্ণতা বা আন্তরিকতাতেও আমার পূর্ণ আস্থা ছিল কিন্তু ওর কাণ্ডজ্ঞানের উপরে চিরদিনই অনাস্থা ছিল। ওর সব কাণ্ডর কথা মনে করে বলতে হলে একটি বই হয়ে যাবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, ওরা সকলেই কি বিবাহিত রে?

সকলেই। শুধু সবুজ ছাড়া। সবুজ ব্যাচেলর। আমাদেব দুজনেরই মতো।

কী করে সবুজ?

ও তো ডাক্তার। তোর মনে নেই? স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ার সময়েই পেন্সিল দিয়ে হাতে খোঁচা মেরে মেরে নীরোগ আমাদের বলতো, "ইন্দেকতান দিত্তি তোকে, বালো হয়ে দাবি, দেখিথ।"

বললাম, সত্যি গুটলু! তোর কিছু মনেও থাকে!

মনে নেই তোর? জগুবাবু স্যার বলতেন, আমার স্মৃতি চির-চিরা। মগজে কিছু ঢুকতে হেভি টাইম নেয়, কিন্তু একবার ঢুকলে নট নড়ন-চড়ন—নট কিচ্ছু হয়ে পাথরের মতো গেঁথে যায়। সবই মনে থাকে।

তারপরই বলল, আমাদের সবুজ ডাক্তারের মতো ডাক্তার হয়েছে বটে।

বেশ গর্বভরেই বলল গুটলু।

কেন? এ-কথা বলছিস কেন? দারুণ প্র্যাকটিস বুঝি? ফিস কত করেছে? তিন-চারশো টাকা? কিসের প্র্যাকটিস? মেডিসিনের না সার্জারির?

গুটলু বলল, দুসস-স-স। আরে সেঃটাই তো কতা। ওর ফিস মাত্র দশ টাকা।

বলিস কী রে? এই বাজারে? তাহলে ফস-স-স ডাক্তার।

আজ্ঞে না! কলকাতার বাঘা-বাঘা নার্সিং হোমও ওকে ডেকে পায়নি। গুচ্ছের রুই-কাতলা হবু-শ্বশুর বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি-গাড়ি,

ঝাঁ-চকচকে চেম্বারের সমস্ত সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, সবুজ শিশুকাল থেকেই যে আদর্শ আঁকড়ে ছিল, সেই আদর্শ থেকে এক চুলও নড়েনি।

হাসলাম আমি।

হাসছিস যে বড়!

গুটলু বলল।

ফুঃ! আদর্শ!

কেন? ফুঃ কেন?

গুটলু রেগে উঠে বলল।

তারপর বলল, পচা, তুই ছেলেবেলাতেও যেমন সিনিক ছিলি, আজও তেমনই আছিস। তোর কোনওই উন্নতি হল না।

এই আদর্শ-ফাদর্শর কথা কেউ আজকাল মুখে বললে বা লিখলেও কিরকম সুড়সুড়ি লাগে যেন। এই আদর্শহীন, বিবেকহীন, ন্যায়-অন্যায় বোধহীন, সততাহীন সমাজে "আদর্শ" কথাটাই সেই পুরনো দিনের যাত্রাদলের সাদা পোশাক-পরা বিবেক, যে মাঝে-মাঝে এসে গান গেয়ে যেত দুই অঙ্কর মধ্যবর্তী সময়টুকু ভরাট করতে, সেই অন্তর্হিত বিবেকেরই মতো। ইনসিপিড। অর্নামেন্টাল। একটা মিথ!

গুটলু, আমার কথাতে মনে হল খুবই আহত হল।

আদর্শর কথা বলছিস কেন? আদর্শর কথা আসছে কোথায়?

গুটলু আরও রেগে বলল, বলছিস কী তুই পচা! আদর্শ নয়? সবুজ মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গণ্ডগ্রামে প্র্যাকটিস করে। তবে অবশ্য সপ্তাহে তিনদিন কাদাইতেও আসে।

কাদাই? সেটা আবার কোথায়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আরে, বহরমপুর শহরেরই একটা পাড়ার নাম কাদাই। যদিও সদর শহর তবুও সেখানেও সে মাত্র দশ টাকাই ফিস নেয়।

সবুজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে আমি বললাম, ও ছাড়া অন্যেরা কে কী করে তা বল। সকলেই তো বলছিস বড়সাহেব হয়েছে। তার মধ্যে আমার মতো কেরানিকে ডাকলি কেন? এমব্যারাস করতে?

কথাটা বলার সময়ে নিজের গলার স্বরেই যেন ঈর্ষার গন্ধ পেলাম। জানি না গুটলুও পেল কি-না। নিজের মনের দৈন্যে নিজেই লজ্জিত হলাম।

গুটলু অবাক চোখে আমার মুখে চেয়ে রইল।

গুটলু বলল, তোকে ডাকলাম, কারণ কনভেনর তো আমি। মুদির দোকানি। আমাকে কম্পানি দেবার জন্যে একজনকে তো অন্তত চাই।

আমি জোর করে হেসে বললাম, ফাজিল!

ফাজলামো নয় রে পচা! এই কনগ্রেগেশানে আমি আর তুইই একমাত্র প্রলেতারিয়েত! লিস্ট সাকসেসফুল।

তারপব বলল, অত অধৈর্য হচ্ছিস কেন? আয় না তুই। দেখবি, দেখবি সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। আমরা না-হয় সাধারণই অন্যদের তুলনায়। তবু ভিক্ষে কবে তো খাই না, চুরি করেও নয়। আমাদের ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স থাকবে কেন? ওরা ওরা, আমরা আমরা। আমাদেব সকলের মধ্যে মিল এইটুকুই যে, আমরা ন্যাঙোটিয়া দোস্ত। এর চেয়ে বড় কথা আর কি আছে!

আমি গুটলুর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, এই পৃথিবীতে গুটলুরা আছে, তাই এখনও বাস করা যায় এখানে।

কিছুক্ষণ পরে কী ভেবে ও বলল, এ-কথা ঠিকই যে অন্যরা, মানে, যারা আসবে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই কেউ-কেটা। আমার তোর মতো ফেকলু নয় কেউই! তবু, আমার কিন্তু মনে হয়, বুঝলি পচা, এই সবুজকে নিয়ে আমরা সত্যিই যতখানি গর্বিত হতে পারি, আর কারওকে নিয়ে আদৌ ততখানি হতে পারি না। এখনও যে শরৎবাবু, তারাশঙ্কর, বনফুল-এর মতো সাহিত্যিকদের সৃষ্ট ডাক্তাব চরিত্রের মতো একজন ডাক্তার বাস্তবেও থাকতে পারে, যাদের কাছে ডাক্তারি এবং মানবপ্রেম সমার্থক, এই দিনে! চিন্তা কর একবার।

বললাম, হুঁ! কিন্তু ঘোর-ঘটি তোকে বাঙাল বারেন্দ্র বামুনদের ভোকাবুলারি কব্জা করল কী করে?

মানে?

মানে, বারেন্দ্র বামুনেরা এবং বরেন্দ্রভূমির সব মানুষই অমনিই কথায় কথায় বলেন: "চিন্তা করেন একবার!"

তাই?

তাই।

তা বরেন্দ্রভূমির মানুষদের চিহ্ন কি?

উত্তর কলকাতার আদি বাসিন্দা গুটলু জিজ্ঞেস করল।

বামুনের কয় প্রকার তা কি জানিস?

আমি বললাম।

দুস্‌স-শালা! আমরা তো গন্ধ বণিক। বামুনের ইতিহাসে আমার

কাজ কী ?

শোন তবে। বামুন বহু প্রকার। রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র মানে উত্তরবঙ্গের (এখন বাংলাদেশ) বরেন্দ্রভূমির বাসিন্দা আর অগ্রদানী।

আর ?

আরও হয়তো আছে। আমি জানি না। আমি নিজেও তো আর বামুন নই।

গুটলু বলল, আর রাঁধুনি বামুনকে বাদ দিলি যে বড় !

হেসে ফেললাম আমি গুটলুর কথাতে। কিন্তু উত্তর দিলাম না।

বললাম, বরেন্দ্রর চিহ্ন হচ্ছে এই সব পদবীব সান্যাল, মৈত্র, লাহিড়ী, ইত্যাদি। বর্ণচোরা চৌধুরী এবং রায়ও আছেন বই-কি।

রাইট। আমার দোকানের ছেলে দুটির মধ্যে একজন মৈত্র, অন্যজন লাহিড়ী ! সত্যিই তো ওরা ওইরকমই বলে। কথায় কথায় বলে, "চিন্তা করেন"। এত চিন্তা কি করা যায় ! দুসস শালা !

এই এক বদ দোষ গুটলুর। ও নিজে যখন কারওকে বলে, চিন্তা কব একবার বা চিন্তা করুন একবার, তখন কেউ চিন্তা না করে কথা বললে তার সমূহ বিপদ। বারেন্দ্ররা যে মোহনবাগান লেন এবং তার পৈতৃক নিবাসও "ইনডেড" করেছে তা ও জানে না যদিও।

তারপরই হঠাৎই আবারও উত্তেজিত হয়ে উঠে গুটলু বলল, আমাদের ছেলেবেলায় শিক্ষক আর ডাক্তারদের যে জায়গা ছিল আমাদের চোখে, সে জায়গা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টাতেই, প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে কোথায় নেমে এসেছেন বল ? শুধু টাকা-টাকা আর টাকার এমন কামনা বোধহয় আর কোনও পেশাতেই ঘটেনি।

তারপর বলল, তুই কী বলিস ?

সকলেই যদি অধঃপতিত হয়ে থাকেন তবে ডাক্তার আর মাস্টারেরা কি দোষ করলেন ! তাঁরা আগে যে সম্মান পেতেন এখনও কি পান ? টাকাই তো এখন সব সম্মান চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। ওঁদের কি দোষ ? ওঁরা তো সমাজের বাইরে নন।

গুটলু বলল, তবু, এই ধর, কালোয়ার, কি পাটের ব্যবসাদার, কি গুড়ের ব্যবসাদার, কি উকিল, কি অ্যাকাউন্ট্যান্ট এঁরা তো টাকা বানাবার জন্যেই এ-সব লাইনে আসেন, না কি ? কিন্তু ডাক্তার আর মাস্টারেরা তো তা করেননি কোনওদিনও। করা উচিত ছিল না অন্তত।

কেন ? উকিল আর অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সকলেই যে টাকার জন্যেই আঁকুপাঁকু করছেন, তা তো নয়। এই ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে ব্যক্তির

উপরে, পেশার উপরে আদৌ নয়। সে গুড়ের ব্যবসাদারই হন, পাটের ব্যবসাদারই হন আর কালোয়ারই হন। কোনও পেশাকেই এমনভাবে "ব্র্যান্ডেড" করাটা আমার মনে হয়, কখনও উচিত নয়। ডাক্তারের মধ্যেও যেমন আদর্শহীন মানুষ আছেন, অ্যাকাউন্ট্যান্টদের মধ্যেও আছেন, উকিলদের মধ্যেও আছেন। আবার আদর্শবান মানুষের অভাব গুড়ের ব্যবসায়ী কি কালোয়ার কি উকিল কি ডাক্তার কি অ্যাকাউন্ট্যান্টদের মধ্যেও খুঁজে অবশ্যই পাওয়া যায়। আজকেও পাওয়া যায়। অনেকই পাওয়া যায়।

তারপর বললাম, যাই হোক, তুই ঠিকই বলেছিস। সবুজের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকব।

তারপর শুধোলাম, ও বিয়ে করেছে ? ছেলেমেয়ে কী ?

আঃ। তোকে দেখি বাহান্নতেই বাহাত্তরে ধরল। বললুম তো একটু আগেই। বিয়েই করেনি। তোর-আমার মতোই অবস্থা ওর। তবে রাঁঢ় রেখেছে কি-না জানি না অবশ্য।

একটু থেমে বলল, ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী ?

এই আরম্ভ হল গুটলুর। ওর মুখটা আলগা। গালাগালি ও খায় বটে সকলেরই কাছে এ কারণে তবে এ-কথাও ঠিক যে ওর কথা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে। ছেলেবেলাতেও ও ঠিক এইরকমই ছিল। বদলায়নি একটুও। রিয়্যাল অরিজিনাল মানুষ একটা আমাদের এই গুটলু।

বললাম, তা হলে তো বন্ধুদের মধ্যে তিনজনই সিঙ্গল রে !

হ্যাঁ। পাঁচজন রমণী আসবেন। অর্থাৎ পরস্ত্রী।

আমি বললাম, বল, বন্ধুপত্নী। পরস্ত্রী আর বন্ধুপত্নীর মধ্যে তফাত আছে।

ও বলল, ওই হল্লো।

তারপরই বলল, তাঁরা কে কোন পদের হবেন, কে জানে !

ন্যাকা বা ঢঙি মেয়েদের আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। আমি বললাম।

গুটলু বলল, মেয়েরা ন্যাকা অথবা ঢঙি না হলে আমার আবার তাদের মেয়ে বলেই মনে হয় না। আর ওরা যদি ন্যাকা অথবা এবং ঢঙিও হয়, বন্ধুরা যদি সারাজীবন সহ্য করতে পারে তো তুই একটা দিনের জন্যে ক্ষমা-ঘেন্না করে নিস। কী রে ! পারবি না ?

গুটলু বলল।

বলেই বলল, ন্যাকাও তো আসবে।

মানে ?

আরে আমাদের ক্লাসের ন্যাকা। তাকেও তো খুঁজে বের করেছি। বললাম না!

সত্যি! তুই একটা ডুবুরী।

গুটলু হেসে বলল, যা বলিস।

হেসে উঠলাম আমি গুটলুর কথা শুনে। ও সত্যিই একেবারে সেইরকমই আছে। চল্লিশবছর আগে ঠিক যেমনটি ছিল। আমার মনে হল যেন ক্লাসের বেঞ্চেও ঠিক আমার পাশেই ও বসে আছে, যেমন বসত, আমার ডানদিকে। বাঁ দিকে বসত সবুজ। পশ্চিমের জানালা দিয়ে আমাদের ক্লাস-রুমে রোদ এসে পড়েছে। একটা চড়ুই পাখি গরাদ গলে এসে মেঝের উপর দিয়ে নিঃশব্দে কয়েকবার লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে গুটলুর পায়ের কাছ অবধি এসেই আবার ফুড়ুত করে উড়ে চলে গেল। স্কুলের পাশের বাড়ির মোটা, ফরসা পঞ্চাশোর্ধ গিন্নি খ্যান-খ্যানে গলায় ডাকলেন : মোক্ষদা, অ মোক্ষদা। চা করো। চা করো। চারটে বাজতে চলল।

মনে হল, এই সেদিনই তো স্কুলে পড়তাম। এরই মধ্যে এতো বছর পার হয়ে গেল! কত যুগ হল আমরা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছি। অথচ মনে হয়, এই সেদিন। যেদিন হরিধ্বনি দিয়ে নিমতলাতে নিয়ে যাবে, সেদিন যদিও আমি আমাতে আর থাকব না, যদি আমাতে থাকতাম, তা হলে হয়তো বলে উঠতাম, ওরে রাজু, বাঁটুল, শ্যামলাল, ছোটকু তোদের এত তাড়া কিসের! এত তাড়া কিসের।

গুটলুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মনে হল, আমি যে কুশানঢাকা সাদা-রঙা কাঠের জলচৌকিতে, কৃষ্ণনগরের ছোটমামির প্রেজেন্ট-করা ; দু'পা তুলে দিয়ে দিয়ে চিঠি লিখি লেখাপড়ার কাঠের টেবলে বসে, সেই জলচৌকিটা কিন্তু থেকে যাবে ঠিকই! আমিই চলে যাব। আমি যখন থাকব না, সেই মোড়াতেও আমার বোনঝি টেঁপির আদরের বেড়ালটি এসে নিজের তুলতুলে সাদা শরীরটিকে গোলাকার করে তার দখল নেবে। মনে-মনে বলবে, বাঁচা গেছে! লোকটা গেছে।

এই তো জীবন। এই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবন। যারা, জীবনভর একটু একটু সুখ, ক্যাডবেরী চকোলেটের ছোট ছোট টুকরোর মতো একটু একটু করে টুকরো-টুকরো ভেঙে খেল, একটু-একটু ভাল লাগা, চোখের কোণে ভালবাসার কচিৎ কৃপণ

ঝালক ; দু-একজন ভালবাসারজনের হাতের ভালবেসে রান্না-করা একটি-বা দুটি পদ, আলু-পোস্ত অথবা পুঁটি মাছের চচ্চড়ি, অথবা একটু নলেন গুড়ের পায়েস পেল, তারই সঙ্গে তার চেয়ে অনেকই বেশি পেল অপমান, অবহেলা, দু'বেলা ভিখিরির মতো দু'মুঠো খেতে পেল, বর্তমানের দৈনন্দিনতার একঘেয়ে আবর্তে আপাদমস্তক চান করল নিঃশব্দে, আমি তাদেরই একজন ; তাদেরই প্রতিভূ। যার নিজস্ব সংসার নেই, স্ত্রী নেই, সন্তান নেই যার ভবিষ্যৎ ফেব্রুয়ারির ভোরের কুয়াশার মতো অস্বচ্ছ, তাদের কাছে এই আজকের দিনটিই সত্যি। একটা একটা করে দিনের মালা গেঁথে বেলা গেল। একটা একটা করে দিন, তারপরে জানালার গরাদের পাশে এসে যমদূত দাঁড়াবে হঠাৎ। গোঁফে চুমকুড়ি দিয়ে বলবে, চল হে বাবু, বেলা গেল। চল চল।

॥ ৪ ॥

দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল। কয়েকঘণ্টা পরেই রবিবার আসবে।

সেদিন রাতে শুতে যাবার আগে দেরাজ খুলে আমার সবচেয়ে ভাল এবং অক্ষত ধুতিটি, ধাক্কাপাড়ের ধুতি, বড় বউদি দিয়েছিলেন আমার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে এবং একটি মুগার পাঞ্জাবি, সেটি মেজ বউদি দিয়েছিলেন, সেই উপলক্ষেই ; বের করে রাখলাম।

সেই ধুতি অথবা পাঞ্জাবি দুটির কোনওটিই এই ব্যাচেলর বুড়োর পরার কোনও অবকাশ অথবা সুযোগ হয়নি। গেঞ্জির মধ্যে যেটি ফাটাফুটি-হীন সেটিও বের করলাম দেরাজ খুলে বেছেবুছে। মোড়াতে বসে, পনেরো মিনিট ধরে কাবলি জুতোতে নিজে হাতে ভাল করে কালি লাগিয়ে, বুরুশ করে চকচকে করে রাখলাম। বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।

পাঞ্জাবির বোতাম খুঁজতে গিয়ে দেখি, মুগার রঙের সঙ্গে যায় এরকম রঙের একটিও বোতাম নেই। সোনার বোতাম আমার নেই। থাকলেও পরতাম না। রুচিতে বাধে।

বড়দার ছোট মেয়ে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে বাপের বাড়ি। তার বিয়ে হয়েছে এলাহাবাদে। জামাই রেলের ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ের পরে এই প্রথম সে বাপের বাড়ি এসেছে। সেই ছুটলুই আমার বোতামের

বাক্স হাতড়ে একটি কালো রঙা পাথরের বোতাম বের করে বলল, ছোটকা, তুমি এটাই পরো।

এ তো একেবারেই যাবে না রে! এক জোড়া বোতাম ছিল, মিনে-করা। কোথায় যে কে নিয়ে যায়!

ছুটলু বলল, যাবে না কি! কী যে বল ছোটকা! এই তো ফ্যাশান আজকালকার। কনট্রাস্ট। উল্টো করো; উল্টো পরো। তোমাদের দিন কি আর আছে? এখন তো কনট্রাস্টেরই দিন।

বললাম, তা হলে দে। মা বলতেন, আপ রুচিসে খানা, পর রুচিসে পিন্না। দে, রাখি এটাই আলাদা করে। সাত সকালে কোথায় খুঁজে পাব? আজ রাতে তো আবার জামাই আসবে। কাল সকালে কখন তোর ঘুম ভাঙবে তা তো ঈশ্বরই জানেন।

আঃ ছোটকা। তুমি না আমার গুরুজন।

গুরুজন এখন আর কেউ নেই রে। এখন সব গুরুজনই গুরুজন।

তারপর ছুটলুকে বললাম, বন্ধুরা বা তাদের স্ত্রীরা এই বোতামের জন্যে যদি কেউ কিছু বলে, তখন কিন্তু আমি তোর নাম বলে দেব। বলব, কনট্রাস্ট-এর আইডিয়াটা কার!

ছুটলু বলল, বোলো। দেখোই না তুমি, গালাগালি তো কেউ করবেই না, উল্টে সকলেই বলবে, যদি কারও চোখ থাকে, আঃ পচা, তুই তো দারুণ মড হয়েছিস রে!

মডটা আবার কি?

আহা ছোটকা, তোমাকে নিয়ে সত্যিই আর পারি না। "মড" মানে জানো না? "মড" মানে, মডার্ন। তুমি কোন যুগে যে বাস করো! সত্যি!

॥ ৫ ॥

মুসলমানেরা দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন। তাদের ধর্ম হিন্দুধর্মের মতন ঘুমন্ত ধর্ম নয়।

Rituals এবং Regimentation এরও অবশ্যই দাম আছে যে-কোনো ধর্মেই। এসব না থাকলে ধর্ম যে আদৌ আছে তা সেই ধর্মাবলম্বীরা ভুলেই যেতে বসেন। হিন্দুরা আর আজকাল ধর্ম পালন করেন কোথায়? গ্রামে-গঞ্জে-মফঃস্বলে ছাড়া? ইংরেজিনবীশ

হিন্দুরাতো এখন ধর্ম ব্যাপারটাকেই ঘৃণ্য বলে মনে করেন।

ধর্ম শব্দটার মানে হচ্ছে, "যাহা ধারণ করে"। সেই অর্থে হিন্দুধর্মের বাঁধনের শক্তি মনে হয় ক্রমশঃই শিথিল হয়ে আসছে। এ ছাড়াও জাত-পাত, জাতিবিভেদ হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু। "বিরাদরী" বা সমতা ইসলামের সবচেয়ে বড় জোর। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কেউই বড় বা ছোট নয়। আল্লার কাছে ছাড়া আর কারো কাছেই মাথা নোয়াতে শেখায়নি ইসলাম।

তবে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে উঠে পড়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বলে আমার সুবিধেই হয়। অনেক বেশি কাজও করা যায়। মসজিদের আজান অ্যালার্মের কাজ করে। মুসলমানদের অনেক অভ্যেস, খাওয়া দাওয়া, ওদের খাটবার ক্ষমতার আমি অনুরাগী।

কেডসটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যাই হেদোর দিকে। ছ'টা বাজার আগেই ফিরে আসি এক কি.মি. মতো হেঁটে। ফিরে এসে রেডিও খুলি, বিবিধভারতী শুনি। তারপর এফ.এম. ব্যান্ডের আওয়াজটা বড় ভাল লাগে। এফ.এম. ব্যান্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় প্রায় রোজই সাড়ে ছ'টা থেকে। গান শুনে মনটা ভাল হয়ে যায় সকালবেলায়। তার পরে দু'কাপ চা খাই।

পুঁটি, ছোট বউদির কাজের মেয়ে, সে-ই আমাকে প্রতিদিন সকালবেলায় ভারি যত্ন করে পর-পর দু' কাপ চা করে দেয়। সঙ্গে দু'টি থিন-অ্যারারুট বিস্কিটও দেয়। বাড়ির আর সকলেই বেশ দেরি করে ওঠে। তার পরে সকাল সকালই চান করতে যাই।

আমার চান করতে অনেকই সময় লাগে। বড় বউদি বলেন, পচা, তোমার শুচিবাই হয়েছে। ব্যাচেলরদের নাকি অনেকেরই শুচিবাই হয়। কী যে করো এতক্ষণ কলঘরে সকাল-সন্ধেতে!

চায়ের পরে ঠাকুর যা দেয়, তাই খাই। কোনও-কোনওদিন কোনও বউদি এসে দাঁড়ান খাওয়ার সময়ে। ঠাকুরকে বকা-ঝকা করেন এটা দাওনি কেন? ওটা দাওনি কেন বলে। তাঁদের নিজেদের হাজারো ঝামেলা। তবুও যে মাঝে-মধ্যে দেখেন এই তো যথেষ্ট। বউদিরা, দাদারা, আমার ভাইপো-ভাইঝিরা সকলেই ভাল। আমার কেউ নেই একথা কোনওদিনও বুঝতে দেননি বা দেয়নি ওরা সকলে মিলে।

বিয়ে করলে বউ কেমন হতো তাই-বা কে জানে? নিজের ছেলে-মেয়েরাও ভাইপো-ভাইঝিদের মতো এতখানি আপন হতো তাই-বা কে বলতে পারে। নিজের বউদিদের সঙ্গে সেই বউ মানিয়ে

থাকতে পারতো কি-না তাই-বা কে জানে ? সে হয়তো "মড" হতো, ছুটলুর ভাষায়। অনেকের ছেলেমেয়েদেরই তো দেখি। ভয়ংকর সব অসভ্য দুর্বিনীত জীব !

মাঝে-মাঝেই নিজেকে বলি, বেশ ভালই তো আছি ! খারাপ কি ? কত মানুষকে দেখি পথে, ঘাটে, অফিসে. আত্মীয়দের মধ্যেও যাঁরা আমার চেয়ে অনেকই খারাপ আছেন। অনেক খারাপ।

খাওয়া হয়ে গেলে পাড়ার মোড়ে গিয়ে মিনি ধরি। তখনও লাইন পড়ে না। চিরদিনই সকাল সকাল অফিস যাওয়াই আমার অভ্যেস।

আজ নিয়ম ভাঙার দিন আমার। ফুরফুর করছে সকাল থেকে মনটা। কতদিন পর দেখা হবে ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের স্ত্রীদের সঙ্গেও, কে জানে তারা কে কেমন ? কী তাদের নাম ? ছেলেবেলায় শীতকালে পিকনিকে যাবার দিন সকাল থেকে যেমন করত মনটা আজ যেন সেরকমই করছে।

ভাবছিলাম যে, এত বছরে বন্ধুরাও নিশ্চয়ই অনেকেই বদলে গেছে। আমিও যেমন অনেকই বদলে গেছি। কিন্তু নিজের বদল তো নিজে দেখা যায় না। না চেহারার বদল বোঝা যায়, না মনের বদল।

যে মানুষটা সতেরো বছর বয়স থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোজই দাড়ি কামাচ্ছে, সেই মানুষটার মুখটা আমার চোখে তো একই রকম আছে। বদলায়নি বিশেষ। খালি চোখে যা পড়ে তা, তার চুল পাতলা হয়ে গেছে, চুলে পাক ধরেছে, গলার কাছটায় মাংস আর চামড়া তেমন টান-টান নেই আর। কেমন ঝুলে ঝুলে গেছে যেন। ভাঁজ পড়েছে অনেকই। কপালেও। একেই বোধহয় বলিরেখা বলে। কিন্তু আমার আয়নাতে আমি যে সেই পচা, সেই পচাই আছি। পচে গেলেও এখনও গলে যাইনি।

কিন্তু এই আমিই যখন হঠাৎ করে বাস স্ট্যান্ডে বা বিবাদী বাগে, সিধু-কানু-ডোহরে অথবা হাতিবাগানের ফুলের বাজারে রবিবারের সকালে আমার কোনও পুরনো বন্ধুকে দেখি, তখন তাকে দেখেই প্রথমে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাই। ভাবি, আরে ! এই বুড়োটা কে ?

সে যখন পেছন থেকে আমার কাঁধ থামচে বলে, এই পচা, আছিস কেমন ? চিনতেই পারলি নে ?

তখন পেছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে আবারও ভাবি, আরে ! এই বুড়োটা কে ? এ কি আমার কোনও জ্ঞাতি জ্যাঠামশাই ? যাঁকে আমি চিনি না। দেখিনি কখনও ? নাম ধরে এমন করে ডাকছেন,

নিশ্চয়ই কোনও গুরুজনই হবেন।

তারপরেই সেই বুড়ো বলে ওঠে, আরে আমি নেড়ু রে, নেড়ু। জান স্কুলের বন্ধু বিডন স্ট্রিটের। তুই ব্যাকে খেলতিস স্কুল টিমে, আর আমি গোলে। মনে নেই তোর। এ কী রে! তুই তো বুড়ো হয়ে গেছিস! আমাকে তুই চিনতে পারলি না।

নেড়ুর মতো কাবওকে দেখলেই আমার মাথায় বজ্রপাত হয়। আতঙ্কিত হয়ে ভাবি, নেড়ু যদি এইরকম হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তো আমারও ওইরকমই হয়ে যাওয়ার কথা! অথচ প্রতিদিন সকালে বাথরুমের আয়নায়, আমি এই পচা, তো সেই স্কুলের পচাকেই দেখি।

এ তো গেল বাহ্যিক রূপের কথা। মানুষের মনের মধ্যে যে কত ভাঁজ, কত ফাটাফুটি, কাটাকুটি, কত শৈথিল্য, কত বক্রতা, কত আঘাতের নীল কালসিটে চিহ্ন, সেসব তো বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।

এই সব কথা ভেবেই আতঙ্কিত হয়ে আছি গুটলুর এই রিইউনিয়নের ধাক্কাটা ঠিক কী প্রকারের হবে, সে-কথা ভেবে।

তারপরে, যারা বিবাহিত, তাদের স্ত্রীরা কে কোন প্রকার, কিরকম পরিবার থেকে তারা একেকজন এসেছেন, কি ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি তাঁদের? তাঁর স্ত্রীর পারিবারিক পটভূমি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং মানসিকতার উপরেও একজন বিবাহিত পুরুষের বদলে যাওয়াটা অনেকখানি নির্ভর করে।

একটা কথা পড়েছিলাম, কোন বইতে তা মনে নেই। কোনও বাঙালি ঔপন্যাসিক-এর বইতেই। যে উদ্ভিদ-জগতে একটা কথা আছে, নাকি "অ্যাকুয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিকস" বলে।

মানে, যদি আনারসের বনে কোনও কলাগাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়, তবে বেশ কিছুদিন পরেই নাকি দেখা যাবে যে, কলাগাছের পাতারাও সব চেরা-চেরা হয়ে গেছে। সেইরকমই, স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে তারাও বদলে যায়। স্বামী স্ত্রীর মতো হয়ে যান অনেকখানি; স্ত্রীও স্বামীরই মতো। কারও পরিবর্তন ভালর দিকে হয়, কারও পরিবর্তন মন্দর দিকে। এই নিয়ম। সংসারের এই নিয়ম।

নিজের সংসার করিনি ঠিকই কিন্তু আমাকেও এই দাদা-বউদিদের সংসার, যার একেবারে গভীরে আমার বাস, হয়তো, নিশ্চয়ই আমাকেও অনেকই বদলে দিয়েছে। তবে এক ঘরে এক খাটে বছরের

পর বছর একজন নারীর সঙ্গে শুয়ে থাকলে, তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ কাটালে, আমার পরিবর্তনটা যতখানি হত, সে ভালই হোক কি মন্দই হোক ; ততখানি যে হয়নি আমি অকৃতদার বলে, একথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম।

॥ ৬ ॥

গুটলু বলেছিল, সল্ট লেকে, পাঁচ নম্বর ট্যাঙ্কের কাছেই ঝাবুর শ্বশুরবাড়ি।

অত বড়লোক ঝাবু এবং তার শ্বশুরমশাই! অন্য বন্ধুরাও হয়তো বড়লোক, আমার চেয়ে বড়লোক তো নিশ্চয়ই! তাই, তাদের কাছে ছোট না হওয়ার জন্যে, উল্টোডাঙার মোড় অবধি বাসে গিয়ে, সেখান থেকে একটি ট্যাক্সি নিলাম। তবে, সাতটার মধ্যে আমি বাড়ি থেকে বেরোতেই পারিনি। কোথাওই তো যাই না। না বেড়াতে, না কাজে। তাই নানা অভ্যেস দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তা বুঝলাম। পৌনে আটটার আগে তৈরি হতেই পারলাম না। যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে।

দেখলাম, বিরাট বাড়ি। লনও আছে পেছনে। ঘাউ-ঘাউ শব্দ করে অ্যালসেশিয়ান কুকুর ডাকছে, বুক কাঁপিয়ে দিয়ে। যেরকম বড়লোকদের বাড়িতে ডাকে। বাড়ির বাইরে, কনটেসা, মারুতি ওয়ান-থাউজ্যান্ড, মারুতি এস্টিম, টাটা সিয়েরা ইত্যাদি ইত্যাদি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, যেরকম সব বড়লোকদের বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতর থেকে স্টিরিওতে সানাইয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।

মনে হল, যেন বিয়ে হচ্ছে কারও।

কলিং বেল টিপতেই গুটলু দৌড়ে এসে আমাকে রিসিভ করল।

বলল, আয়, আয়। যেন ওরই বাড়ি এটি। আজ যেন ওরই মেয়ের বিয়ে!

কী রে, কারও বিয়ে হচ্ছে নাকি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গুটলু বলল, হ্যাঁ রে শালা। তোর। তোরই আজ বিয়ে।

চ', চ', ভেতরে চ'।

গুটলু, আমার হাত ধরে একটি লম্বা সবজে সবজে গ্রানাইট পাথরের করিডর দিয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

মাঝপথেই এক বয়স্ক ভদ্রলোক এবং সর্বাঙ্গে সোনার গয়না এবং নীল বেনারসী শাড়ি-পরা এক মহিলা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন আমাকে রিসিভ করতে।

চিনতে পারছিস পচা ? এই ঝাবু।

গুটলু বলল।

ঝাবু !

আমি অবাক গলায় স্বগতোক্তি করলাম।

ঝাবু বলল, হ্যাঁরে পচা। তোকে তো চেনাই যায় না। খেলাধূলা আব করিস না বুঝি ? কলম পিষে-পিষে কী চেহারাই করেছিস ! তুই কি অ্যাকাউন্ট্যান্ট না কি ?

আমি হেসে বললাম, আমি মসীজীবী। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হয়। কেরানি রে, কেরানি !

তোকে, গুটলু যদি না চিনিয়ে দিতো তা হলে চিনতেই পারতাম না।

তোকেও চিনতে পারতাম না আমি।

কেন ? কী পবিবর্তন দেখলি আমার মধ্যে ?

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ঘাড়ে-গর্দানে যা হয়েছিস। তবে থলথলে হোসনি। এন. আর. আই-রা থলথলে হতেই পাবে না। যত বড়লোকই হোক, নিজে হাতে কাজ তো কিছু করতেই হয় !

তো কেমন হয়েছি ?

বিদেশি পিগারির শুয়োরের মতো।

হত্তভাগা !

বলেই, আমার কাঁধে ভালবাসার চাপড় মারল ঝাবু।

ঝাবুর স্ত্রীর নাম মন্দিরা, গুটলু বলল।

গয়নার জন্যে মানুষটিকেই ভাল করে দেখা গেল না। তবে আশা রাখলাম, পরে দেখব।

ভাবছিলাম, কলকাতার চিড়িয়াখানাতে এতবার গেছি, অথচ 'স্লো লরিস' দেখলাম এই মাত্র ক'দিন আগে চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুশান্ত ভট্টাচার্য দেখালেন বলে, তেমনই এন. আর. আই-দের কথাও অনেকই শুনেছি এবং পড়েছি এবং গুটলুরই কল্যাণে এই প্রথম একজন জলজ্যান্ত এন. আর. আই দেখলাম।

প্রথম দর্শনেই এন. আর. আই. ঝাবু এবং তার সোনামোড়া স্ত্রীকে দেখে আমি একটা ধাক্কা খেলাম।

জগদানন্দ স্কুলে আমার সহপাঠী চল্লিশ বছর আগের ঝাবুর সঙ্গে

এই মানুষটির বিন্দুমাত্রই মিল নেই।

আমরা করিডরের বাঁদিকে ঘুরে একটি প্রকাণ্ড বসবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মেঝেতে তিন-চার ইঞ্চি পুরু ক্যাটকেঁটে লাল-রঙা কার্পেট পাতা—গাঢ় সবুজ-রঙা দেওয়াল। ভিকটোরিয়ান ডিজাইনের তিনটি সোফা সেট, গুটলুদের বাড়িতে যেমন আসবাব আছে ল্যাজারার্স কোম্পানির, তেমন অ্যান্টিক নয়, তবে অ্যান্টিক অ্যান্টিক ভাব আছে। সাম্প্রতিক অতীতে বানানো। কাগজের ফুল, ফুলদানিতে।

আশ্চর্য। যে বাড়িতে এত বড় লন, বাগান ; সে-বাড়িতে কোনও বিশেষ দিনেও কাগজের ফুল ! দেওয়ালে পার্ক স্ট্রিটের অকশানিয়দের দোকান থেকে কেনা বিদেশি অয়েল-পেইন্টিং, আগেকার দিনের অশিক্ষিত জমিদারের বা বেনিয়ানের বা স্টিভেডরের বা গুড়ের বা পাটের আড়ৎদারের বাড়ির দেওয়ালে যেমন সব ছবি ঝোলানো থাকতো আর কী !

জানি না কেন, আনন্দ করতে এসে, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে এসে এই সাত সকালেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। বমি-বমি পেতে লাগল। যার কানে সুর আছে, তার বেসুরো গান শুনে যেমন কষ্ট হয়, যার রুচি সূক্ষ্ম, তারও স্থূলরুচির মানুষের কাছে এলে তেমনই কষ্ট হয়। অথচ এই কষ্টের কথা অন্যকে বোঝানো যায় না, অধিকাংশব পক্ষেই তা বোঝা সম্ভবও নয়।

আমি ঝাবুকে বললাম, আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

ঝাবু বলল, আসাটা তোমার ইচ্ছেতে ঘটেছে পচাবাবু কিন্তু যাওয়াটা পুরোপুরি আমাদেরই হাতে। আমাদের মধ্যে সময় কাটাতে তোর ভাল লাগবে না ? ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড।

আমি তুতলে বললাম, না না, ঠিক তা নয়।

দরজাতে দাঁড়িয়ে গুটলু চেঁচিয়ে উঠল। এই যে পচাও এসে গেছে। সকলেই এসে গেল ! অ্যাটেনশন এভরিবডি। দাঁড়া পচা, প্রত্যেকের সঙ্গেই একে একে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।

কিছু না বলে, ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্রথমে গদাই। কই ! গদাই লস্কর ?

বলেই, গলা তুলে বলল, হোয়্যার আর উ্য মিস্টার গদাই লস্কর ?

কে যেন বলল, আরে চেঁচাচ্ছিস কেন ? টয়লেটে গেছে।

আর একজন বলল, এই তো বেরিয়েছে।

যে ভদ্রলাক দাঁড়িয়ে উঠলেন,তাঁর সব চুল পেকে গেছে।

গোলগাল চেহারা। কুচকুচে কালো রঙ।

গদাইরা, তখন খুবই গরিব ছিল। আমার মনে আছে। আমি যখন টিফিন খেতাম, গদাই এমন করে তাকাত যে, ওকে অর্ধেকটা না দিয়ে আমি কোনওদিনই খেতে পারিনি। আমরাও যে কিছু বড়লোক ছিলাম, এমন নয়। সত্যি কথা বলতে কি কলকাতার অলিতে-গলিতে তখন এমন বড়লোকের ভিড় ছিল না। তা ছাড়া আমাদের জগদানন্দ ইনস্টিট্যুশান মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের স্কুলই ছিল।

বড়লোকদের মধ্যেও যেমন স্তর থাকে অনেক, গরিবের মধ্যেও তেমন থাকে। সেই স্তরের মধ্যে হয়তো আমার পরিবারের অবস্থা গদাই-এর পরিবারের চেয়ে সামান্য একটু উঁচুতে ছিল।

গদাই বড় ভাল মানুষ ছিল। বিনয়ী, রসিক। কিন্তু এই গদাই-এর সঙ্গে সেই গদাই-এর কোনও মিলই খুঁজে পেলাম না। অত্যন্ত বাজে ছাত্র ছিল গদাই। সেটাও মনে আছে। যামিনীবাবুর কানমলা খেয়ে খেয়ে ওর বাঁ কানটা ডান কানের চেয়ে বড় হয়ে গেছিল। ও যাচ্ছেতাই উচ্চারণ করত ইংরেজি শব্দগুলো। ও "কনসান্স"কে বলতো "কনশাস", "স্যাংচুয়ারি"কে বলতো "সেঞ্চুরি"। এই দুটি শব্দের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

গুটলু আমার ঘোর ভাঙিয়ে বলল, মিট মিঃ গদাই বোস। ওরফে অশেষরঞ্জন বোস। এখন বিরাট বড়লোক। এক্সপোর্টার।

বললাম, কী এক্সপোর্ট করো গদাই?

গদাই বলল, আমি আবার তুমি কবে হলাম পচা। "তুই" করেই তো বলতিস চিরদিনই।

বলব, বলব। আমাদের "চিরদিন"তো আর চিরদিনই থাকবে না। একটু সময় দে।

ঝাবু গুটলুকে বলল, আরে মধ্যে যে চল্লিশটা বছর খেয়ে এসেছিস। চল্লিশটা সেকেন্ড তো দিবি বেচারিকে সেই ধাক্কাটাকে কাটাবার জন্যে।

সকলেই ঝাবুর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল।

গুটলু বলল, গদাই বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছে পচা, বুঝেছিস। মস্ত বড় এক্সপোর্টার।

কী এক্সপোর্ট করো তুমি?

এতবছর পরে দেখা, "তুই" বলতে সংকোচ হল। ও এখন বিরাট লোক। কেরানি বন্ধুর অভব্যতাতে রাগও করতে পারে হয়তো।

গদাই বলল, ম্যানহোল-কভার এক্সপোর্ট করি।

ও। তা হলে তো ফাউন্ড্রি আছে বল। কাস্ট-আয়রন ফাউন্ড্রি? এবারে সাহস করে তুইই বলে ফেললাম।

না রে, না। অন্যের ফাউন্ড্রি থেকেই কিনি আর এক্সপোর্ট করি। আমেরিকাতে আমার কনট্যাক্টস আছে। অর্ডারের কোনওই কমতি নেই। খালি কিনি আর পাঠাই। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে রপ্তানিওয়ালাদের উপরে অনেকই দিন হল তো সরকার ইনকাম-ট্যাক্স প্রায় তুলেই দিয়েছেন। সেকশান এইট্টি.এইচ.এইচ.সি.। কাজেই, বেঁচে-বর্তে আছি কোনওক্রমে। নাথিং টু কমপ্লেইন অ্যাবাউট।

গুটলু বলল, বাবা। আইন-কানুন তো অনেক শিখেছিস দেখছি।

লক্ষ করলাম যে, কমপ্লেইন শব্দটা খুব নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করল গদাই। শুনে আমার আবারও মনে পড়ে গেল ও কমপ্লেইনকে বলত কমপ্লান। কমপ্লান তখন সবে বেরিয়েছে সম্ভবত। কমপ্লানের খুব বিজ্ঞাপন দিত সব কাগজে।

গুটলু বলল, জানিস তো পচা, গদাইয়ের দার্জিলিংয়ে বাড়ি আছে, শান্তিনিকেতনে বাড়ি, পুরীতে বাড়ি করবে। ও সুতানুটি ক্লাবের মেম্বার। বর্তমানে ওর হাইট অফ অ্যামবিশান হচ্ছে, টলি ক্লাবের মেম্বার হওয়া।

টলি ক্লাব মানে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আরে টালিগঞ্জ ক্লাবকে, শর্টে বলে টলি ক্লাব। সায়েবরা তো টালিগঞ্জ বলত না, বলত টলিগঞ্জ।

গদাই বলল, আমার মতো অজ্ঞকে, বিজ্ঞর মতো।

গুটলু বলল, টলি-ক্লাবের মেম্বার হলে কলকাতায় আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। উচ্চতম স্ট্যাটাস হচ্ছে "টলি ক্লাবে"র মেম্বার হওয়া। তারপরে চা বাগান কিনবে মিরিক-এর কাছে।

মিরিক-এ কখনও গেছিস পচা?

গদাই বলল।

কোথায় আর গেছি বল? একবার বিন্ধ্যাচলে গেছিলাম বড় জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে। তুষারকান্তি ঘোষমশায়ের বাড়িতে ছিলাম। দারুণ বাড়িটি।

গুটলু বলল, পচা, তুই ঠিক সেইরকমই আছিস। বিন্ধ্যাচলের মতো জায়গাতে কোথায় থাকলি না থাকলি সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। আসলে হচ্ছে জল। পাথর খেলেও পাথর হজম করিয়ে দেয় সেই জল।

বললাম, ঠিকই বলেছিস।

তারপরই গুটলু বলল, হাসি কই ? হাসি, এদিকে এসো।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালে, গুটলু আমার দিকে ফিরে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, এই যে গদাইয়ের স্ত্রী হাসি।

আমার প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে যাবার অবস্থা হল। এতক্ষণ হাসিকে লক্ষ করিনি। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, এ তো সেই হাসিই!

গুটলু বলল আমার অনুমানকে নিশ্চিত করে, হাসিদের বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগর শহরে। ওদের কোনও সন্তান নেই। হাসি সুযোগ পেলেই নাকি শান্তিনিকেতনে চলে যায়। গাছ-গাছালি, পাখির ডাক, নির্জনতা ভালবাসে।

গুটলু কি বলল বা বলল না, আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এই হাসিকে এক সময়ে আমি চিনতাম। প্রেম নিবেদনও করেছিলাম। তবে খুবই সূক্ষ্মভাবে। ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের মেয়েকে আমাদের সময়ে যেমনভাবে প্রেম নিবেদন করতাম তেমন ভাবেই। অনেক সময়েই, মুখে কিছু না বলেও আমরা প্রেম নিবেদন করতে পারতাম। শুধুমাত্র চোখের চাহনি দিয়ে। তখনকার রেওয়াজও সেরকমই ছিল।

আমার মামাবাড়ি ছিল কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়াতে। ছুটিছাটাতে সেখানেই যেতাম। কত যে গাছ ছিল তখন কৃষ্ণনগরে, বিশেষ করে নেদেরপাড়াতে ; এখন ভাবলেও অবাক লাগে। সব জায়গাতেই কত গাছ ছিল। শেষবারে গেছিলাম গতবছরে, ছোটমামার শ্রাদ্ধে। এখন চেনাই যায় না পুরো জায়গাটা। কৃষ্ণনগরের চূর্ণী নদী, সুন্দর নির্জন সব রাস্তাঘাট। গির্জা, পালচৌধুরীদের বাড়ি, রাজবাড়ি, চরকের মেলা ; কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ। অমিয়নাথ সান্যাল মশাইয়ের বাড়ি ছিল স্টেশন থেকে যেতেই বড় রাস্তার উপরে, ডানদিকে।

তখন কৃষ্ণনগরে গেলেই বড়মামার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যেতাম। বড়মামা, গান-বাজনার পাগল ছিলেন। খুব ভাল তবলা বাজাতেন, পাখোয়াজ, খোল। সান্যাল মশায়ের কাছে কত কী শুনতে পেতাম। কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না। কত দিনের কত সব অভিজ্ঞতার কথা বলতেন সুপণ্ডিত মানুষটি। সঙ্গীত শাস্ত্রে কত গভীর জ্ঞান ছিল। কত গভীর যে ছিল তা বোঝার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না আমার। কী অসামান্য রসবোধ ছিল তাঁর। গুণীর মতো গুণী মানুষ। অথচ আজকের দিনে অল্প জলে ফরফর-করা কুচো মাছেদের

মতো, সঙ্গীত সমালোচকদের মতো তাঁর মধ্যে কোনও ফরফরানি ছিল না। শান্ত, সমাহিত ছিল তাঁর পাণ্ডিত্যময় ব্যক্তিত্ব। অতি সাধারণ জীবনযাত্রা, একটি অতি সস্তা কালো ফ্রেমের চশমা, ছোট্ট একটি গোঁফ, হিটলারের গোঁফের চেয়ে একটু বড়। এই সব অনুষঙ্গ কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়ার হাসিরই সঙ্গে আমার মনে মুহূর্তের মধ্যে ফিবে এল।

বক্সি সাহেবদের বাড়ির পাশেই ছিল হাসিদের বাড়ি। বক্সি সাহেব মানে, যিনি কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল হয়ে রিটায়ার করেছিলেন আজ থেকে অনেকই বছর আগে। তাঁর এক ভাইয়ের সঙ্গেও মাঝে মাঝে চৌরঙ্গীতে দেখা হয়ে যেত কিছুদিন আগে পর্যন্তও। শুনেছিলাম, তিনি ইনকাম-ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। তিনিও বহুদিন হল রিটায়ার করেছেন। তাঁর নাম ছিল আর্যেন্দু। নামটার অসামান্যতার জন্যেই মানুষটিকে মনে আছে। উনিও ছিলেন অসামান্য ভদ্র, বিনয়ী, সাহিত্য এবং সঙ্গীতমনস্ক।

এত কথা মনে পড়ে গেল শুধু হাসিরই জন্যে। হাসিকে শেষ দেখেছিলাম, খড়কে-ডুরে শাড়ি-পরা, তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগরেই। সেই শাড়িতে কি কি রঙ ছিল তাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। এতদিন পরেও। খয়েরি, হলুদ আর কালো। সাদা জমির উপরে। একটি খয়েরি ব্লাউজ পরেছিল হাসি। সাইকেল রিকশা থেকে নামছিল ও, ওদের বাড়ির গেটে। হাতে একটি প্যাকেট নিয়ে। সে প্যাকেটে কি ছিল কে জানে! মস্ত কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল একটি। পথটি ফুলে ফুলে সিঁদুরে হয়ে ছিল। আর আমি মামাবাড়ির রকে বসে ছিলাম।

আমার মনের মধ্যে সেই হাসি এক হলুদ-বসন্তব কোকিল-ডাকা আশ্চর্য সকালের কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার ফ্রেমের মধ্যে চিরটাকাল বাঁধানো ছিল। আজ প্রায় পঁচিশ বছর পরে সেই ছবিটি যে আজও অম্লান আছে আমার মনে, তা ওকে ন্যা দেখলে বুঝতাম না।

আমার তখন বছর পনেরো চাকরি হয়ে গেছে। সাহিত্য পড়ি, কবিতা লিখি। কিন্তু আমাদের যৌথ পরিবার, টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সাধারণ। হাসির মতো সুন্দরী গুণবতী মেয়ে, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করলেও তার গুরুজনেরা তার জন্যে অনেক বড়লোক এবং "সাকসেসফুল" পাত্রের খোঁজে ছিলেন।

হাসি বড় ভাল গান গাইত। একটি গান অতুলপ্রসাদের, ওর

মুখের, এখনও আমার কানে লেগে আছে। "আমি তোমার ধরবো না হাত, নাথ তুমি আমায় ধরো, যারা আমায় টানে পিছে তারা আমা হতেও অনেক বড়।"

বাণীতে ভুলও হতে পারে। কতদিন আগে শোনা। একেবারে সুরে-বসা গলা ছিল হাসির। সুর কোনও স্বরে এতটুকু নড়ত না। তার সঙ্গে তার গলায় ছিল ভাব আর দরদ। আজকাল অনেক সব নামী নামী গাইয়েদের গান শুনি অতুলপ্রসাদের, রবীন্দ্রসঙ্গীতও শুনি। সেই সব গায়ক-গায়িকার গান শুনে আনন্দ তো পাই-ই না, উল্টে তাঁদের গান বড় পীড়া দেয় আমাকে। সেই প্রেক্ষিতে হাসির গানের কথা আরও বেশি করে মনে পড়ল।

অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ছিল হাসি। একটি দিনও দেখিনি, শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের রঙের সঙ্গতি নেই। খুব হাসিখুশিও ছিল। মৌটুসী পাখির মতো ছিল তার গলার স্বর। কোনওরকম স্থূলতাই তার ধারে কাছে আসতে পারত না। কিন্তু আজ আমার স্কুলের সহপাঠী গদাইকে তার স্বামী হিসেবে দেখতে পেয়েই বুঝলাম যে, হাসি বড় বোকা মেয়ে। পরমুহূর্তেই বুঝলাম যে, তার নিজের মতামতের কোনও দাম তো ছিল না। সেই সময়ে গরিব বড়লোক কোনও মেয়েরই নিজস্ব মতামতের দাম ছিল না অধিকাংশ পরিবারেই। তাদের 'পার' করা হত। এই পর্যন্ত।

বিয়ের পরে গদাইয়ের চোখ ধাঁধানো সাচ্ছল্যের সহজ সুখে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে না পেরে কি খুবই অসুখী হয়ে আছে? এখনও কি ও বোকাই আছে? সেই অসুখ ওর মুখের মধ্যে, ওর বুদ্ধির মধ্যে প্রসাধনের উপরে এক অন্য প্রলেপ যুক্ত করেছে, বিষাদের প্রলেপ?

পরমুহূর্তেই খুব বকলাম নিজেকে। কত কীই যে এক মুহূর্তে ভেবে নিলাম।

'উইশফুল থিংকিং' বলে, ভাল ভাবনাকে। কিন্তু হাসি যে অসুখী এই ভাবনাকে তো উইশফুল থিংকিং বলা যায় না।

মনে আছে, হাসির যখন বিয়ে হয় তখন সে আই.এ. পাশ করেছে সবে। ফার্স্ট ডিভিশনেই পাশ করেছিল। জানি না, পরে পড়োশুনো আর করতে পেরেছিল কি না। স্বাবলম্বী সে হয়নি। সেই সময়ে কম মেয়েই হত।

আমি বললাম, নমস্কার।

মনে হল, হাসি যেন খুব অপরাধী। মেজ মামিমার আনা সম্বন্ধটা

নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল, সেকথা মনে করে কি অপরাধ বোধ করছে ও ? না কি এও আমার কল্পনাই !

আমার খুব মজা লাগছিল। জানি না, হাসিরও মজা লাগছিল কি না !

মুখে নমস্কার না বলে, ও হাত জোড় করে নমস্কার করল।

যদিও ও মস্ত বড়লোকের স্ত্রী, কিন্তু ও একটি অতি সাধারণ হাল্কা হলুদ টাঙাইল শাড়ি পরে এসেছে, একটি সাদা ব্লাউজ। টিপ পরেছে বড় করে, হলুদ রঙের। ফিগারটি সেরকম সুন্দরই আছে। বয়সকে কোন জাদুতে যে ও ঠেকিয়ে রেখেছে, কে জানে !

ভাবছিলাম, অনেক সময়ে সুখ যেমন করে, সুখের অভাবও অনেক মানুষকে সুন্দর করে। ভিতরে ভিতরে জ্বলন থাকে বলে, সেই জ্বলন এক আশ্চর্য বিধুর দীপ্তি দেয় সেই সব মানুষের মুখাবয়বে।

কী বলব, ভেবে না পেয়ে, আমি কয়েক মুহূর্ত হাসির মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। আমি যে হাসিকে চিনি, সেকথা ওর স্বামী গদাই না হয়ে অন্য কেউ হলে তখুনিই বলে ফেলতাম। কিন্তু আজকের গদাইকে তা সাহস করে বলতে পারলাম না। কারণ গদাইয়ের মতো মানুষদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যতই স্ফীত হোক না কেন, দু'নম্বর তিন-নম্বর টাকা যতই থাকুক না কেন, সচরাচর তাদের হৃদয়ের ঔদার্য বেশি থাকে না।

এ-কথা মনে হয়েও আমার আশ্চর্য লাগল যে, গদাই আমার বাল্যবন্ধু, ছেলেবেলার পড়ার সাথী, খেলার সাথী, অথচ আজ মনে হচ্ছে হাসিই যেন আমার অনেক বেশি আপন গদাইয়ের চেয়ে। অথচ হাসি কোনও অর্থেই আমার কেউই নয়।

এক ঝলক দেখেই বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি যে, হাসি বড় অসুখী। তাকে একদিন একতরফা ভালবেসেছিলাম বলেই, জীবনের শেষে এসে মিছিমিছি তাকে কোনওরকম কষ্ট দিতেই আমার মন রাজি ছিল না।

মনে পড়ে গেল, হাসির বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে মেজ মামিমা, যিনি হাসির সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব ওদের পরিবারে করেছিলেন, আমাকে লিখেছিলেন যে, খুব বড়লোকের সঙ্গে হাসির বিয়ে হচ্ছে, বুঝলি পচা। আশীর্বাদ হয়ে গেল গত শনিবারে। ব্যবসাদার ছেলে। নিজেই করেছে ব্যবসা। এক পুরুষের। কিন্তু ছেলেটিকে আমার একটুও ভাল লাগেনি। হাসির তুলনাতে বয়সও বেশি। ছেলেটি তোর চেয়েও বড় হবে, বয়সে। ভাল লাগেনি তার

পরিবারের কারওকেও। হাসিটার কপাল বড়ই খারাপ। সংসারে টাকার অবশ্যই প্রয়োজন। ভীষণই প্রয়োজন। কিন্তু টাকাই একমাত্র জিনিস নয় যা মানুষকে সুখী বা সম্মানিত বা তৃপ্ত করতে পারে। তোর মামারা মস্ত বড়লোক নন। কিন্তু আমি মানসিকতার মিলের কারণেই তোর মামাবাড়িতে বউ হয়ে এসে ভারি সুখী হয়েছি এ-জীবনে। বিবাহিত নারী-পুরুষের মানুষদের সুখের প্রকৃতির নানারকম হয়। বিয়ে-করার পরেই শুধু সেকথা বোঝা যায়। আমি হাসিকে আর তোকে যতটুকু জেনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছিল যে, তোদের দুজনের বিয়ে হলে তোরা সবদিক দিয়েই খুব সুখী হতে পারতি।

মামিমা কবিতা-টবিতা লিখতেন, সাহিত্যেরও খুব ভক্ত ছিলেন। আধুনিক লেখকদের লেখা তাঁর ঠোঁটস্থ ছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর খুব ভাল করে পড়া ছিল। তাই হয়তো তিনি লিখতে পেরেছিলেন সে-চিঠিতে আমাকে, যে, "বুঝলি পচা, একদিক দিয়ে ভালই হল, যদিও এটা হাসির পক্ষে খুবই দুঃখের হল, কিন্তু দেখিস, হাসি তোকে চিরদিন মনে রাখবে। তুই যে ওকে ভীষণই পছন্দ করতিস, সে-কথা তো আমার চোখ এড়ায়নি, শুধু আমারই চোখ কেন, নিশ্চয়ই হাসির চোখও এড়ায়নি। আমি মেয়ে বলেই, তোর চেয়ে হাসিকে অনেকই বেশি ভাল করে জানতাম। তোকে ফিরিয়ে দেওয়ার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে বেচারিকে সারাজীবনই করতে হবে। এই স্বামী, হাসি যে রকমের সুখ বা আনন্দ চায় তার কিছুমাত্রই হাসিকে দিতে পারবে না। এই আমার অনুমান। আমি ভুল হলেই সেটা সকলের পক্ষেই আনন্দের হবে। আমিও চাই যে হাসি সুখী হোক।"

ওই ঝলমলে বসার ঘরে আমার ছেলেবেলার হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েও আমার মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু হাসিকে নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ গুটলু দিতে আদৌ রাজি নয়। ভালই হল। আরও কিছুক্ষণ সময় আমি হাসির সামনে দাঁড়িয়ে ওর মুখে অপলকে চেয়ে থাকলে এত জোড়া চোখের মধ্যে কোনও-না-কোনও চোখ নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পারত হয়তো।

প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে, বড়ই দুঃখের কথা, তার শকুনি-সত্তা যতখানি সজাগ ও প্রবল তার কোকিল-সত্তা ততখানি নয়। মানুষ-মানুষীকে দুখী দেখলে আমাদের সুখের অন্ত থাকে না। আমরা

কেউ তো আধুনিক নই, সকলেই ব্যাক-ডেটেড—সকলেরই জন্ম তো তিরিশ দশকে। প্রাচীন সব বটবৃক্ষ আমরা! শকুনে ভরা।

গুটলু বলল, এবারে সুশান্ত। চিনতে পারছিস পচা? তুই পচাকে চিনতে পারছিস সুশান্ত? আয় আয়, এগিয়ে আয়।

সুশান্ত বলল, সত্যি বলছি গুটলু, রাস্তায় দেখা হলে পচাকে চিনতে পারার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

বললাম, টিপিক্যাল কেরানি আমি। আমার জীবিকাটা গুটলুর কাছে যদি আগেই জেনে নিতিস, তবে হয়তো সহজেই পারতিস চিনতে। কেরানিদের চেনা সব থেকে সহজ।

সুশান্ত প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আমি সেকথা বলব না। কেরানিরা কি মানুষ নয়?

গুটলু বলল, আরে দাঁড়া! পরিচয়টা সম্পূর্ণ করাই। বড় বেশি কথা বলিস তুই সুশান্ত।

সুশান্ত ইঞ্জিনিয়ার, বুঝলি পচা; অবশ্য বিদেশ-টিদেশ যায়নি। কিন্তু বড় ইঞ্জিনিয়ার। আই.আই.টি-র ইঞ্জিনিয়ার। খড়্গপুর থেকে পাশ করেছিল। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এখন টিসকোতে কাজ করে। বিরাট অফিসার। জামশেদপুরের নীলডিতে বাংলো। আহাঃ, কী সুন্দর বাংলো রে পচা! চল, আমি আর তুই যাই একবার বেড়াতে। চারদিকে সোনাঝুরি গাছ, কী সুন্দর সব রাস্তা। গাছে গাছে একেবারে ভরে রয়েছে জায়গাটা। যাই-ই বলিস, জামশেদপুর সম্বন্ধে আগে এরকম ধারণা ছিল না আমার। ট্রেনে, জানালার ধারে বসে যখন রাতের জামশেদপুরকে দেখতাম, ফার্নেসের আগুন, তরল গলা-লোহা ঢালার সময়ে যে নীল-সবুজাভ-লাল আলোর ঝলকানি তা দেখেই মনে হত, জায়গাটা ভীষণ গরম হবে বোধহয়। আর ভদ্রলোকের থাকার মতো আদৌ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সত্যিই বলছি, সুশান্তর কাছে গিয়ে কয়েকদিন নীলডিতে থেকে, আমার ধারণাটাই পাল্টে গেছে।

তারপরই গুটলু গর্বভরে বলল, আমাদের সুশান্ত খুবই অ্যামবিশাস। ও একদিন কোম্পানির বোর্ডে না গেলেও বোর্ডের খুব কাছাকাছি পৌঁছবে। আমাকে ওদের কোম্পানির কিছু প্রডাক্টের এজেন্সি দেবে বলেছে।

গুটলুর এই কথাটা শুনে একটা ধাক্কা খেলাম আমি। এই রিইউনিয়ন কি গুটলু তার কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ঘটালো? কোনও ঘটনাই কি স্বার্থগন্ধহীনভাবে ঘটানো যায় না

আজকাল ? গুটলু সম্বন্ধে ধারণাটা খারাপ হয়ে গেল।

তারপর গুটলু বলল, ও রেগুলার গলফ খেলে। চেহারাটা দেখে বুঝতে পারছিস না! কী রকম সান-ট্যান চেহারটা। হাত দুটো দেখেছিস! এক ঘুষি মারলেই রোগা-পটকা কেরানি পচা চার ডিগবাজি খেয়ে পড়বে।

আমি হেসে বললাম, তা ঠিক। কেরানি কেন, অনেক বড়সাহেবও পড়বে। ওর যা হাত!

আর এই সুপূর্ণা!

গুটলু আবার বলল, সুশান্তর স্ত্রী। মেড-ফর-ইচ আদার। বুঝলি। সে-ও স্বামীরই মতো পার্টিবাজ। জিন খেতে ভালবাসে, আমারই মতো। এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার খুবই মিল, এমনিতে বাড়ির তেঁতুলের শরবত গন্ধরাজ লেবুর পাতা দিয়ে খেলে কী হয়! আমি পেলে, ওসব ভাল জিনিস ছাড়ি না। আমার এক খুড়তুতো ভাই আছে, বুঝলি সুশান্ত, সে বলে, দ্যাখ গুটলুদা, বিনি পয়সায় যদি পাস, তা হলে দাদের মলমও ছাড়বি না। খেয়ে নিবি। আমি তার কথাই মেনে চলি।

একটু থেমে গুটলু বলল, মেড-ফর-ইচ-আদার বলি এইজন্যে সুপূর্ণা ও সুশান্তকে, ওরা দুজনে মানসিকতায়, স্বভাবে, অভ্যেসে, একেবারে যেন অন্যজনের জন্যেই তৈরি।

গুটলুকে তো এতদিন পছন্দই করতাম কিন্তু ওর মধ্যে যে একজন বড়লোকচাটা মোসাহেব আছে এবং অত্যন্ত প্রকট হয়েই আছে; সে-কথাটা আগে জানিনি।

জানি না কেন এমন হল। ও তো নিজেও অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। আজ না-হয় অবস্থা আর তত ভাল নেই কিন্তু ওর বড়লোক-চাটা বা মোসাহেব হওয়ার দরকার কি ছিল!

তারপর ভাবলাম, আমিই কি আসলে আমার সফল বন্ধুদের দেখে ঈর্ষান্বিত হলাম! আমিই কি ইতর?

তারপরই নিজেকে বললাম, তা কেন! সাফল্যের সংজ্ঞা তো আর শুধুমাত্র অর্থই নয়! অর্থ ছাড়া আরও অনেক কিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকে সাফল্যে। ওরা বড়লোক হয়েছে বলেই যে সফল মানুষ এমন মনে করে ঈর্ষান্বিত হবার কিছুমাত্রই নেই আমার।

বললাম, ছেলে-মেয়ে? তোদের ছেলে মেয়ে কী?

গুটলুই উত্তর দিল ওদের হয়ে। বলল, একটি মেয়ে। ভেরি স্যাড। মেয়েটি মেন্টালি রিটার্ডেড।

মিলনস্থল কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি ভাবছিলাম, সুপূর্ণাকে আগে তো আমি চিনতাম না। আগে সে কেমন ছিল তা আমার পক্ষে জানাও সম্ভব নয়। কিন্তু সুশান্তটা একেবারেই বদলে গেছে। সুপূর্ণাই কি বদলে দিল ?

আমরা সুশান্তকে শান্ত্ বলে ডাকতাম। ছিলও খুব শান্ত। সবসময়েই স্কুলে সাদা শার্ট আর সাদা হাফ প্যান্ট পরে আসত। পরিপাটি করে চুল আঁচড়াত। একটি চুলও এদিক-ওদিকে হওয়ার উপায় ছিল না। সাধারণত এইরকম স্বভাবের ছেলেরা স্বার্থপর হয়। কিন্তু ছেলেবেলাতে ওকে স্বার্থপর বলে মনে হয়নি। তবে ছেলেবেলা থেকেই ওর মধ্যে এক ধরনের মেটিরিয়াল অ্যামবিশান দেখতে পেতাম। পড়াশুনায় খুবই ভাল ছিল। কী করলে ভাল রেজাল্ট হবে, সে-সম্বন্ধে ও অত্যন্ত সচেতন ছিল।

আমাদের দেশে তখনও "ভাল ছাত্র" বলতে যা বোঝায়, এখনও তাই-ই বোঝায়। এ.বি.টি.এ. এবং ডবল্যু বি.টি.-এর কোশ্চেনের সব বই যোগাড় করে স্ট্যাটিসটিক্যাল মেথডে মীন মিডিয়ান মোড কষে নিয়ে, সেইসব কোশ্চেন ঝাড়াই-বাছাই করে সায়ান্স অফ প্রবাবিলিটি অ্যাপ্লাই করে, সবসুদ্ধ প্রতি বিষয়ে কুড়িটি করে প্রশ্ন বেছে প্রচণ্ড পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপক অথবা শিক্ষকদের দিয়ে সেইসব প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে নিয়ে এক-একটি বিষয়ের এক-একটি আলাদা খাতা করে সেই প্রশ্নের উত্তর সারিবাদি সালসার মতো তিক্ত হলেও গলাধঃকরণ করে পরীক্ষার খাতাতে যারাই উগরে দিতে পারে, তাবাই এদেশে সচরাচর "মেধাবী" বলে চিহ্নিত হয়। আমাদের শান্ত সে-কারণেই অত্যন্ত মেধাবী বলে চিহ্নিত হয়েছিল। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষাতে চারটে লেটার পেয়েছিল এবং ছিয়াত্তর পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে জগদানন্দ স্কুল এবং শিক্ষকদের মুখোজ্জ্বল করেছিল। নো ওয়ান্ডার যে, আমাদের শান্ত জীবনে দুরন্ত উন্নতি করবে। এবং করেওছে।

সুশান্ত আর সুপূর্ণা দুজনে আবার দু'পা পেছনে হেঁটে গিয়ে সোফাতে বসল।

এদিকে এসো।

গুটলু বলল, এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে। সে-ভদ্রলোকের গোঁফে কাঁচা-পাকা চুল। মাথারও চুল কাঁচা-পাকা। একটি হলুদ সিল্কের পায়জামা, তার উপরে নীল সিল্কের পাঞ্জাবি ; বাঁহাতে একটি সোনার ব্যান্ডের সোনার ঘড়ি। একেবারে আমপাড়া ঘড়ি। নিশ্চয়ই খুব দামি হবে। হাতে পাইপ। একটু আগেই মুখ থেকে

নামিয়েছেন।

গুটলু বলল, চিনতে পারছিস পচা একে ? কে বল তো ?

আমি বোকার মতো চেয়ে থাকলাম। তারপর বললাম, আজ কি আমাকে তুই পরীক্ষা দেওয়াতে এনেছিস এখানে !

গুটলু বলল, চিনতে পারলি না তো! আরে ও আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ।

তারপর বলল, ওকে দেখে তো দেখছি তুই-ই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গেলি।

আমি হাসলাম বোকার মতো। অন্যরাও হাসল।

স্থিতপ্রজ্ঞ, যদিও নামেই স্থিতপ্রজ্ঞ, ওর মতো বোকা ছেলে আমাদের ক্লাসে কমই ছিল। এমনকি আমার চেয়েও বোকা ছিল ও। বোকাদেরও সহ্য করা যায়, কিন্তু ও ছিল বোকা এবং পাজি। ক্লাসের পরীক্ষাতেও টোকাটুকি করত। কোনওদিনও পড়াশুনা করেনি। ক্লাস এইটে থাকতেই রেসের মাঠে যেত। ওদের পাড়ার একটি মেয়ের প্রতি দুর্বলতা ছিল। ক্লাস নাইনে পড়ত মেয়েটি, আমরা তখন টেন-এ। মধুময়ী গার্লস স্কুলে পড়ত মেয়েটি। মেয়েটির নাম এখনও মনে আছে, চামেলি। চামেলি স্থিতপ্রজ্ঞকে পাত্তা দিতো না এবং ওদের পাড়ার একটি ছেলে, যার নাম ছিল সৌম্য, তার প্রতি দুর্বলতা পোষণ করত চামেলি। সৌম্য খুব ভদ্র সভ্য ছেলে ছিল, ডাক্তারি পড়তো। ওর বাবাও ছিলেন নাম করা ডাক্তার। যেহেতু চামেলি ওর মতো বাজে ও বকা ছেলেকে পাত্তা দিতো না, স্থিতপ্রজ্ঞ, সেই রাগেই একদিন সন্ধেবেলা সৌম্যর পেটে ক্ষুর চালিয়ে দেয়। শুধু তাই-ই নয়, মুসলমান কসাই গুণ্ডাদের কাছে শেখা বিশেষ পদ্ধতিতে ক্ষুরটি পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুরিয়েও দেয়। নাড়ি-ভুঁড়ি তো কেটে যায়ই, ক্ষুরে মরচে ছিল বলে সেই ক্ষত সেপটিকও হয়ে যায়। বাবা ডাক্তার হয়েও বাঁচাতে পারেন না ছেলেকে। মারা যায় সৌম্য। পুলিশের এক ডি.আই.জি.-কে মোটা ঘুষ খাইয়ে স্থিতপ্রজ্ঞর বাবা তাকে অবধারিত জেল থেকে বাঁচান। সকলেই জানতাম আমরা একথা। এই যে-ছেলের অতীত ইতিহাস, স্বাভাবিক কারণেই সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি কোনওরকম সূক্ষ্ম বৃত্তিতেই তার কোনওদিনই কোনও ঔৎসুক্য থাকার কথা ছিল না। ক্লাস টেন-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মশাইকে ঘুষ দিয়ে প্রাইভেট টিউটর রেখে টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করেছিল স্থিতপ্রজ্ঞ। তাতেও লাভ হয়নি কোনও। কারণ, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাতে আমাদের ক্লাস থেকে

যারা ফেল করেছিল তাদের মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ একজন। স্কুলের মধ্যের ফেলুড়েদের মধ্যে নিচের দিক থেকে ফার্স্ট হয়েছিল সে। খুবই বড়লোকের ছেলে ছিল। মাঝে-মাঝেই ও গাড়ি করে আসতো। আমাদের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ছেলেদের স্কুলে সেই গাড়ি চড়ে আসাটা মোটেও দৃষ্টিনন্দন ছিল না।

স্থিতপ্রজ্ঞদের অনেক চাকর-বাকরদের মধ্যে একজন ওর টিফিন নিয়ে রোজ স্কুলে আসত টিফিনের সময়ে। ও আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে গরমের দিনে ঘোল, গিরিশ দের সন্দেশ ইত্যাদি খেত। শীতকালে গরম ফুলকপির শিঙাড়া, ফ্লাস্কে গরম দুধ, ঘন কালো, পান্তুয়া।

সেসব দেখে আমাদের খিদে বেড়ে যেত।

গুটলু বলল, স্থিতপ্রজ্ঞ এখন দুবাইতে থাকে। সপ্তাহে চার-পাঁচ লাখ টাকা কামায়। চিন্তা করতে পারিস, পচা?

বললাম, না।

হার্টফেল করে মরেই যেতাম একটু হলে। আমার মতো যার কেরানি হওয়ারও যোগ্যতা ছিল না সে... ! টাকা কি হরির লুট হচ্ছে? টাকাই কি একমাত্র মূল্যমান?

আর এই যে ঝিনি, স্থিতপ্রজ্ঞর বউ।

গুটলু আমার ঘোর ভাঙিয়ে বলল।

স্থিতপ্রজ্ঞর মা-বাবাকে আমার মনে ছিল। খুব ভাল মানুষ ছিলেন তাঁরা। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমরা গেলেই অনেক কিছু খাওয়াতেন। ওদের বাড়িতেই প্রথম ফ্রিজ দেখেছিলাম। মনে আছে। হাতিবাগানে থাকতেন। স্থিতপ্রজ্ঞর বাবা ইনকাম ট্যাক্স-ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার ছিলেন। খুব ভাল ইংরেজি বলতেন। লিখতেনও চমৎকার। সাহেবদের কাছে কাজ শিখেছিলেন।

আমি ভাবছিলাম গুটলু আর ঝাবু এই লোচ্চা খুনিটাকে কেন এখানে ডেকেছে আজ? খুব বড়লোক হলেই কী খুনির খুনের অপরাধ মাফ হয়ে যায়!

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসিমা-মেসোমশাই কেমন আছেন? মানে, তোর মা-বাবা?

স্থিতপ্রজ্ঞ কাঁধ শ্রাগ করে বলল, ওয়েল। বাবা নেই, মা আছেন।

তোদের ওই নীলিমা মিত্র রোডের বাড়িতেই কি থাকেন মাসিমা?

আরে না, না। সে তো এজমালি বাড়ি ছিল। সে-বাড়ি কবে

বেচে দিয়েছে আমার বেচারাম কাকারা। মা এখন থাকেন আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বড়িশাতে।

ও। তা ছোট ভাই কী করে?

ছোট ভাই একটি কাগজের রিপোর্টার। আঁতেল।

কী নাম?

নাম দিয়ে কি করবি? নাম বললেই কি আর চিনবি? সে তো আমার মতো ওয়েল-নোন কেউ নয়।

তুই কি বড়িশাতেই উঠেছিস?

আরে দূর দূর! ওখানে থাকা সম্ভব নয়। ইমপসিবল। দুবাইতে আমার ফাইভ বেড-রুমড ফ্ল্যাট। সেন্ট্রালি এয়ার-কন্ডিশনড। মার্সিডিজ গাড়ি চড়ি। আসলে কি জানিস পচা, অভ্যেস খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আমার পক্ষে এখন বড়িশাতে গিয়ে থাকা একেবারেই ইমপসিবল। বুঝলি। আমি যদি-বা পারি, ঝিনির পক্ষে তো নয়ই। ইন্ডিয়ার যা অবস্থা, বিশেষ করে ক্যালকাটার! দিনকে দিন ডিটরিয়েট করছে। ওঃ হরিব্‌ল। আর কী পল্যুশান। বোথ সাউন্ড অ্যান্ড এয়ার। এখানে যার কোনও চয়েস আছে এমন কেউ থাকে, না আসে!

আমি বললাম, তা হলে আসিস কেন?

কী করব! প্রতি বছরই তো একবার করে আসতেই হয়।

কেন?

আরে বুড়িটা তো বেঁচে আছে এখনও। তা ছাড়া ঝিনির পেরেন্টস খুবই চান যে ও একবার করে আসুক। ওঁদেরও নিয়ে যাই অলটারনেট ইয়ারে।

মাসিমাকে নিয়ে গেছিলি?

হাঃ। সে বুড়ি কী ইংরেজি জানে!

তা উঠিস, মানে ওঠো কোথায়?

উঠি ওই ঝিনিদের বাড়িতেই। ঝিনির দাদা সি.এম.ডি.-এর মস্ত বড় কন্ট্রাক্টর। এই সল্ট লেকেই থাকেন।

ঝিনির দিকে তাকিয়ে দেখলাম একেবারে গলুই-আহ্লাদী! কিছু মেয়ে থাকে না! শাড়ি, ভাল গয়না, ঝকঝকে গাড়ি, দারুণ বাড়ি এ-সবের চেয়ে বেশি কিছু যে কোনও মানুষের চাইবার থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে তারা এমনই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অজ্ঞ বলেই হয়তো সে এত খুশি। নইলে স্থিতপ্রজ্ঞর সঙ্গে কোনও গভীরতাসম্পন্ন মেয়ের বিয়ে হলে, তার পক্ষে হাসির মতোই অসুখী হওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই

ছিল না।

স্থিতপ্রজ্ঞ ও ঝিনির সঙ্গে দেখা হবার পরে শকড্ হইনি। ও তো ওইরকমই ছিল। যেমন দেবা তেমনই দেবী জুটেছে তার। ওদের তবু ক্ষমা করা যায়, কারণ স্থিতপ্রজ্ঞর কোনওদিনই অন্যরকম হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ওর গোড়া থেকে আগা সবটাই ফাঁকিবাজি, টোকাটুকি, ঘুষ-ঘাষ মিথ্যাচার এবং চালাকিতে ভরা।

কিন্তু সুশান্তটা অনেকই বদলে গেছে। ও যে কেন এরকম হয়ে গেল ? ওর মাটিটা তো অন্যরকম ছিল। সেই মাটিতে অন্যরকম গাছ খুব সহজেই বাড়তে পারত। সুন্দর কোনও গাছ। ঋজু, কনিফারাস, সবুজে সবুজ হয়ে, স্নিগ্ধ সুন্দর থাকতে পারত সুশান্ত সারাটা জীবনই। অথচ...

মনে হল, সুশান্ত যে অন্যরকম হয়ে গেছে, তার জন্যে হয়ত সুপূর্ণাই দায়ী। যদিও আমি নিজে বিয়ে করিনি, কিন্তু অনেকই দম্পতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং আজ সকালে আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের স্ত্রীদেরও দেখছি। স্ত্রীদের প্রভাব যে স্বামীদের উপর খুবই পড়ে এবং স্বামীদের প্রভাবও স্ত্রীদেরও উপরে পড়ে, ভাইসি-ভার্সা ; এবং তাই বিয়ের পরে কে যে কিরকম হয়ে যাবে এ-কথা বিয়ের আগের মানুষকে দেখে সত্যিই যে বোঝা যায় যায় না তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। সম্ভবত দম্পতির মধ্যে যে বেশি প্রবল, সেই প্রভাবিত করে অন্যকে। এই প্রাবল্য, বুদ্ধি মেধা বা অন্য কিছুর প্রাবল্য নাও হতে পারে। অনেক সময়েই অনেক বেশি বুদ্ধিমান বা অনেক বেশি গুণী স্বামী অথবা স্ত্রী অপরের ইচ্ছা মেনে নেন; অন্য কোনও কারণে নয় ; শুধুমাত্র শান্তিরই কারণে। আরও অনেক সময় হয়তো মেনে নেন সন্তানের মুখ চেয়ে। সুশান্ত হয়তো শান্তির কারণে, তার সন্তানের মুখ চেয়েই সুপূর্ণার ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে বদলে ফেলেছে আমূল।

সুশান্তর স্ত্রী সুপূর্ণা বড় বেশি গয়না পরেছে। অনেক অশিক্ষিতা মেয়েও সাজপোশাকের শালীনতার কারণে তাদের অশিক্ষার দৈন্যটাকে ঢেকে রাখতে জানে। কিন্তু কেউ কেউ অত্যধিক গয়না পরে তাদের ভেতরের গভীর অশিক্ষাকে বড় সহজ গোচর এবং প্রকট করে তোলে। চোখে লাগে।

এই গুটলুটাই ডোবাল আমাকে।

যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই ঘটল। তবে লাভও হল। হল বৈকি ! মস্ত লাভ। হাসি। তবে, এই দেখা হওয়া আমার জন্যে সুখ বয়ে

আনবে না দুঃখ তা অন্তর্যামীই জানেন।

চল্লিশ বছর আগে যাদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে পড়াশুনা করেছি, যাদের সঙ্গে খেলেছি, মারামারি করেছি, যাদের সঙ্গে ভাগ করে টিফিন খেয়েছি, যাদের মা-বাবাকে মাসিমা-মেসোমশাই বলে ডেকেছি, যাদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে মনে করেছি, সেই সমষ্টিগত জীবন তো কবেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এককেটি বীজকে জীবন এক এক জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একেকরকম মাটিতে রোপণ করেছে। কেউ হয়েছে পাহাড়ের পাইন, কেউ হয়েছে মরুভূমির গুল্ম, কেউ হয়েছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের হ্যাঁতাল গাছ, কেউ-বা ঊষর রাজস্থানের কাঁটাঝোপ, কেউ-বা গাঙ্গেয় সমতলের মস্ত অশ্বত্থ ; কেউ বিহার, উত্তরপ্রদেশ কি মধ্যপ্রদেশের মহুয়া, কেউ ছাতিম, চাঁর, কেউ শাল, সেগুন ; কৃষ্ণচূড়া। আবার কেউ-বা তিস্তা উপত্যকার হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলের নিভৃত অভ্যন্তরের লজ্জাবতী, অথবা সুউচ্চ লাভা লুলেগাঁও-এর কর্বুর অর্কিড।

এদের মধ্যে মিল থাকার তো কথা নয়। মিল খুঁজতে যাওয়াটাই বাতুলতা।

ভাবনাতে পেলে, আমার কোনওদিনও খেই থাকে না। ভাবনার গতি সম্ভবত আলোর গতির চেয়েও বেশি যা, সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

কত কিমি ?

জানি না।

আমরা পুরনো দিনের মানুষ। এখনও দূরত্ব বোঝাতে মাইলই বোঝাই। কিমিতে যেন ঠিক বোঝা হয়ে ওঠে না। আমাদের ক্রোশ তো এখনও "ডাল ভাঙা ক্রোশই"।

ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে গুটলু বলল, এবারে নেকসট কাপল। ন্যাকা। ন্যাকা দি গ্রেট। এগিয়ে আয়। এগিয়ে আয়, সস্ত্রীক।

ন্যাকা আমার দিকে এগিয়ে এল।

ন্যাকাটা কিন্তু ঠিক সেইরকমই আছে চেহারাতে। খুবই ভাল লাগল ওকে দেখে। স্কুলে সত্যিই ন্যাকা ছিল। মেয়েলি মেয়েলি। এখন কিন্তু একেবারেই ন্যাকা নেই। ন্যাকাটা কি সত্যিই একইরকম আছে ? চেহারাতে তো আছে। কিন্তু চরিত্রে ?

ন্যাকা একটা ধুতি পরে এসেছে। সেই ধুতির উপরে সাধারণ একটি আদ্দির পাঞ্জাবি। হাতে স্টিলের ব্যান্ডের একটা সাধারণ টাইটান ঘড়ি। ভাল লাগল। ক্যাটক্যাটে সোনা পরে বড়লোকি

দেখাবার কোনও প্রবণতা নেই।

প্রচণ্ড সরল এবং তরল ছিল ন্যাকা স্কুলে। কিন্তু এখন সেই সারল্য হয়তো-বা আছে কিছু কিন্তু তারল্যের কিছুমাত্রই আর অবশিষ্ট নেই।

গুটলু বলল, ন্যাকা হরকৃষ্ণ কলেজের ইকনমিকসের প্রফেসর। বাম রাজনীতি করে।

ন্যাকাকে দেখে মনে হল যে, ন্যাকার মধ্যে আদর্শ ব্যাপাবটা এখনও বেশ প্রবল আছে। আমার দেখা দিশি কম্যুনিস্টদের মধ্যে অধিকাংশই যেমন আপাদমস্তক ভণ্ড, ন্যাকাকে দেখে এবং ওর সঙ্গে কথা বলে, সেরকম মনে হল না। চারিদিকের এই মূল্যহীনতার, এই ভন্ডামির স্রোত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি এখনও মনে হয়। ও প্রচণ্ড চেষ্টাতে যেন দু'পা শক্ত করে এই সব-ভাসানো স্রোতের মুখে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ন্যাকার আর্থিক অবস্থা সাধারণ। আমার অন্য সব বন্ধুরা, ঝাবু, গদাই, সুশান্ত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ এদের তুলনায় ন্যাকা খুবই সাধারণ। আজকে ও হয়তো গরীবই কিন্তু ন্যাকা ছেলেবেলাতে খুবই বড়লোক ছিল। মানে বড়লোকের ছেলে। ও প্রতিদিনই গাড়ি করে স্কুলে আসত। যদিও ব্যাপারটা ওর নিজের একেবারেই পছন্দর ছিল না। ন্যাকার সাম্যবাদটা বোধহয় পোশাকি নয়। ওর ভিতরে সাম্যবাদের বীজ সুপ্ত ছিল নিশ্চয়ই সেই শিশুকালেই।

ন্যাকার বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার। কলকাতার নাম করা ব্যারিস্টার। হয়তো বাবার জীবনের সাচ্ছল্যের কোনও-কোনও দিক ওকে ব্যথিত করেছিল। সাচ্ছল্য যে একার ভোগের জন্যে নয়, সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েই উপভোগ করার ; এই বোধ সম্ভবত শিশুকালেই ওকে বিদ্ধ করেছিল বলেই ও সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিল। অবশ্য এ সবই আমার অনুমান। সম্পূর্ণই অনুমান। যেহেতু সে আমার, আমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু, তাই ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃত সাম্যবাদী ন্যাকার জন্যে আমি গর্বিত বোধ করলাম। সিনেমা বা ট্যাক্সির লাইসেন্স পাওয়ার জন্যে অথবা সল্ট লেক-এ জমি পাবার জন্যে ও সাম্যবাদী হয়নি।

বললাম, এখনও সেতার বাজাস ? কি রে ?

দূর, দূর।

ন্যাকা বলল।

তারপর বলল, ওসব কি আর ফাঁকি দিয়ে হয় ? ফাঁকি দিয়ে বড়

চাকুরে, অধ্যাপক হওয়া যায়, যেমন আমি হয়েছি। গাইয়ে-বাজিয়ে-লেখক ফাঁকি দিয়ে হওয়া যায় না।

বললাম, তাও তুই বললি কথাটা। এমন কথা তো আজকাল কারও মুখেই শুনি না। সকলেই মনে করে যে, সব কিছু হওয়াই সমান সহজ। বড় চাকরি করা, বড় ব্যবসাদার হওয়া, বা পেশাদার, কি বড় লেখক, বড় গায়ক, বড় বাজিয়ে, কি বড় চিত্রী হওয়া সবই যেন সমান। আজকাল আর বাবা আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব কি বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবদের দিন নেই।

গুটলু বলল, নে, এখন তোরা থাম, পরে আবার কথা বলিস। মেনকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই পচার। এই যে, এসো মেনকা। মেনকা, ন্যাকার স্ত্রী।

মেনকা কালো ছিপছিপে। সুন্দরী বলব না। কিন্তু ভারি একটা আলগা শ্রী আছে মুখে। সাদা একটি শান্তিপুরী শাড়ি পরেছে। ফলসা-রঙা পাড়, সঙ্গে ফল্‌সা-রঙা ব্লাউজ। গলাতে ফলসা-রঙা টেরাকোটার লকেটের একটি হার, দু'হাতে টেরাকোটার একটি করে বালা।

এর আগে কোনও মেয়েকেই আমি টেরাকোটার, মানে পোড়ামাটির বালা পরতে দেখিনি হাতে। চওড়া খুবই কম। তার ওপরে সুন্দর কাজ করা। খুব ভাল লাগল দেখে, স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেয়ে। হাতের ব্যাগটিও পোড়ামাটি রঙের। যদিও কাপড়ের। দু'কানে দু'টি পোড়ামাটির দুল। খুব পাতলা যদিও। কারুকার্য করা। এবং সবচেয়ে ভাল লাগল অতি ছোট্ট একটা পোড়ামাটির নথও পরেছে নাকে। টিপ পড়েছে, তাও পোড়ামাটির রঙের। কিংবা জানি না, পোড়ামাটি দিয়েই সিঁদুরের মতো টিপ পরেছে কি-না।

সিঁথিতে আজকাল কোনও মেয়েই প্রায় সিঁদুর দেয় না, সে-ও হয়তো দেয় না। কিন্তু পোশাকের অঙ্গ হিসাবে সম্ভবত সে সিঁথিতে পোড়ামাটি রঙের সিঁদুর পরে এসেছে। আমি ওর রুচিতে একেবারে অভিভূত হয়ে বললাম, বাঃ।

লক্ষ করলাম, আমার বাঃ শুনে, হাসি অপাঙ্গে একবার তাকাল আমার দিকে।

মেনকা বলল, এ-সব দেখার চোখ কিন্তু বেশি পুরুষের নেই। কলকাতার মেয়েদের খুবই মন্দভাগ্য বলতে হবে যে আপনার মতো পুরুষকে এতদিন ব্যাচেলর রেখেছে তারা।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আপনার মতো চোখ দিয়ে তো সব মেয়ে আমাকে দেখেনি। কোনও মেয়েই আমাকে দেখেনি। আর ব্যাচেলর আছি বলেই হয়তো চোখ দুটো খোয়াইনি এখনও।

গুটলু বলল, জানিস তো, মেনকা ন্যাকার ছাত্রী ছিল। ন্যাকার চেয়ে বয়সে অনেকই ছোট। ন্যাকা একেবারে শিশু বধ করেছে। বুঝলি তো! তবে এরাও দুজনে একেবারে মেড-ফর-ইচ আদার।

সেটা অবশ্য দেখে বোঝা গেল। রুচিতে, আদর্শে, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে মেনকার যে তার এককালীন অধ্যাপকের সঙ্গে অনেকই মিল, সেটা প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়। তা কারওকেই বলে দিতে হবে না।

বললাম, রিটায়ারমেন্টের তো বয়স হয়ে এল রে ন্যাকা। বাবার বাড়িতেই কি থাকিস এখনও ?

ন্যাকা বলল, অধ্যাপকদের রিটায়ারমেন্টের বয়স বেশি। তা ছাড়া প্রকৃত অধ্যাপক যাঁরা, তাঁরা কি কোনওদিনই রিটায়ার করতে পারেন ? বাবার বাড়িতে থাকি না রে। বাবার বাড়িতে ভাইয়েরা থাকে। আমি কলেজের কোয়ার্টারেই থাকি।

তা রিটায়ার করে থাকবি কোথায় ? কোনও আস্তানা কি করেছিস ?

তা করিনি। তবে নিরিবিলি কোনও জায়গাতে, শান্তিনিকেতনের মতো কোনো জায়গাতে ছোট্ট নিজস্ব আস্তানা করব তখন, এমন ইচ্ছা আছে।

শান্তিনিকেতনে করবি ?

না রে! শান্তিনিকেতনে জমি কেনার সামর্থ্য আমার নেই। আজ আর নেই। দশ বছর আগে হলেও হয়তো পারতাম।

কিন্তু আমার স্বভাব তো তোরা জানিসই। মনে নেই চ্যাটার্জি স্যার চিরদিনই কান মুলে দিতেন পরীক্ষার খাতা সবচেয়ে শেষে দিতাম বলে!

সবাই কি আর করিৎকর্মা হয় ? "এনোক" আর "আর্ডেন"-এর মধ্যে তফাত তো চিরদিনই ছিল, থাকবেও চিরদিন।

গুটলু বলে, কলকাতার বড়লোকেরা হামলে পড়ে শুধু জায়গাটাকেই নষ্ট করেননি, জমির দাম সত্যিই আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

ন্যাকা বলল, কোনও মফস্বল শহরের প্রান্তে একটু বেশি জমি নিয়ে, বেশি মানে এক-দেড় বিঘা, ছোট্ট একটি বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছা

আছে। যেখানে বাড়িটা উপলক্ষ হবে। গাছ-গাছালিই আসল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, জানিস, প্রায়ই আমি আর মেনকা, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে বসবার ঘরে বসে আমাদের বাগানে কি কি গাছ থাকবে, কোথায় কোন গাছটি থাকবে, পায়ে হেঁটে বেড়াবার রাস্তা কোন কোন গাছতলা দিয়ে যাবে, এ-সব আলোচনা করি। গাড়ি তো নেই, কোনওদিন হবেও না। সাইকেল রাখার গ্যারাজ থাকবে একটা ছোট্ট। সাইকেলই ভাল, দেখবি, সারা দেশ এখন আবার সাইকেলেই ফিরে যাবে, পলিউশন-ফ্রি রাইড, দাম সস্তা, এক্সারসাইজ হয়। চায়নায় যেমন দেখে এসেছিলাম। গরিব দেশে সাইকেলের মতো জিনিস নেই। যাই বলিস আর তাই বলিস।

তা, তাই যদি মনস্থ করে থাকিস, জমিটা এখন থেকে বন্দেবাস্ত করে ফ্যাল। গাছ তো আর মেনকার মতো তোর ছাত্রী নয় যে, তুড়ি দিলি আর বিয়ে করে ফেললি। গাছ বাড়াতে সময় দিতে হয়। তুড়ি দিয়ে গাছ বাড়ে না।

আমার কথাতে ওরা দুজনে হেসে উঠল।

তোদের ছেলেমেয়ে কী রে?

একটিই মেয়ে।

মেনকা বলল।

কোথায় পড়ে? কী পড়ে?

এখন পড়ে বেথুন কলেজে। তবে ইচ্ছে আছে ওকে শান্তিনিকেতনে দেবো, সঙ্গীতভবনে। রবীন্দ্রসঙ্গীতটা খুবই ভাল গায়। ছবিও আঁকে।

তবে দুঃখের বিষয় কী জানিস? আজকে কে ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, আর কে গায় না তার বিচার কে করবে? বিচারক তো মিডিয়া।

আমি বললাম।

ন্যাকা বলল, ভুল। সম্পূর্ণই ভুল। মিডিয়া, তাদের বিদূষক, মোসাহেব, স্বার্থপ্রণোদিত চাকর-বাকরদের, যতই ক্ষমতা দিক, আসল ক্ষমতা প্রকৃত বোদ্ধাদেরই আছে; এবং চিরদিন থাকবে। "পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।"

মেয়েকে তুখোড় প্রতিযোগী করে, চাকরি পাওয়ানোর জন্যে অথবা বিরাট বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে, এই দম্পতির মাথা ব্যথা না থাকায় এ-যুগে এদের সত্যিই ব্যতিক্রমী বলে মনে হল। মনে হয় যেন দুটি সুন্দর গাছের নিচে একটি চারা গাছ জন্মেছে। কবে কোন পাখি ফল ঠুকরে ফেলেছিল নিচে, তার বীজ থেকে চারা জন্মেছে।

সেই চারা কত বড় হবে, কোন দিকে তার ডাল ছড়াবে, তা সেই চারার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে গাছ দুটি। কোনওরকম জারিজুরি বা গার্জেনি সম্ভবত এরা একরকম করেই না সেই সন্তানের ওপর। সেই কারণেই হয়তো প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে ওদের একমাত্র কন্যার "নিজস্ব ব্যক্তিত্ব" যাকে বলে তা গড়ে ওঠার। একটা কথা প্রায়ই মনে হয় যে পৃথিবীতে যা কিছুই "গড়ে ওঠার" তার অধিকাংশই আপনা থেকেই গড়ে ওঠে বা হয়ে যায়। "গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার" মতো ল্যাজে মোচড় দিয়ে দিয়ে তাদের "হয়ে ওঠাতে" হয় না যে এই কথাটা আজকালকার কম মা-বাবাই বোঝেন। বোঝেন না বলেই খুবই ভাল লাগল ন্যাকা আর মেনকাকে দেখে।

গুটলু বলল, তোরা দুজনে যে জমে আঠা হয়ে গেলি। দাঁড়া। পরে আবার হবে। এখনও সকলের সঙ্গে আলাপ করানো বাকি যে!

গুটলু বলল, আয় সবুজ, এদিকে আয়।

দেখলাম, সবুজের চেহারাটাও একেবারেই পাল্টে গেছে। সবুজ ছিল ফরসা। ধবধবে ফরসা। চাপা নাক। মাথা ভর্তি কালো চুল। সবসময়ে রঙিন জামা পরে আসত। স্ট্রাইপ। তাও আবার বিভিন্ন রঙা স্ট্রাইপ।

ওকে ছেলেবেলাতে আমরা জেরা করাতে ও একদিন কবুল করেছিল যে, ওর মামার ছিট-কাপড়ের দোকান আছে, সেখান থেকেই কাট-পিস মামা বিনে পয়সাতে দেন। মাকেই দেন। সেইসব কাট্-পিস দিয়ে পাড়ার দর্জিকে দিয়ে ওর মা সুন্দর সবুজের জন্যে নতুন নতুন জামা বানিয়ে দেন। ওর ওই বিভিন্ন-বর্ণ রঙিন জামার জন্যেই সবুজকে বিশেষ করে মনে আছে আমার। আশ্চর্য! এরকমও ঘটে সংসারে। মানুষটাকে প্রায় ভুলেই গেছি কিন্তু তার জামার কথা মনে আছে।

কিন্তু এই সবুজের চেহারা একেবারেই অন্যরকম। সেই ধবধবে ফর্সা ইট-চাপা ঘাসের মতো রঙ রোদে-জলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এখন ওকে রীতিমতো কালোই বলা যায়। যেমন ঝাবুকেও কালো বলা যায়। তবে ঝাবুর চেহারা কালো হয়েছে, মনে হয়, বেশি মদ্যপানের কারণে। লিভার খারাপ হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু সবুজকে দেখলেই বোঝা যায়, ওর রঙ জ্বলেছে রোদে জলে। হয়তো কিছুটা চাঁদেও। অন্য কোনও কারণে নয়।

সবুজ এগিয়ে আসতেই গুটলু বলল, তোকে তো বলেইছিলাম আগে যে, সবুজ ডাক্তার। মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামে এবং

বহরমপুরের শহরের কাদাইতে ও প্র্যাকটিস করে দশ টাকা ফিস নিয়ে। আজকাল ডাক্তারেরা অর্থগৃধ্নুতায় অন্য সব পেশাদারদেরই লজ্জা দিতে পারেন। ডাক্তারদের মতো এমন 'হায় টাকা! হায় টাকা!' সম্ভবত আর কোনও পেশার মানুষই করেন না। কিন্তু আমাদের সবুজ রিয়েলি একসেপশান। উই অল শ্যুড অফ বি প্রাউড অফ হিম।

গুটলু বলল।

গুটলু ইংরিজি টিংরিজি বিশেষ বলে না। হঠাৎ বাল্যবন্ধুর কৃতিত্বে এবং মহত্ত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে শ্লাঘা ভরে একটি ইংরেজি বাক্য বলে ফেলল।

তারপর বলল, জানিস তো পচা, ন্যাকা, গদাই তোরা সকলেই শোন যে, কলকাতার বাঘা-বাঘা নার্সিং হোম ওকে ডেকেছিল। ওর মতো জেনারেল প্র্যাকটিশনার আজকাল নাকি দেখাই যায় না। বহু ডাক্তারের মুখেই শুনেছি আমি। মানে, বিধানবাবু যেমন রুগী ঘরে ঢুকলেই তাকে দেখেই বলে দিতেন কী হয়েছে, আমাদের সবুজের খ্যাতিও সেরকমই। আর সবুজ যদি কোনও "কল"-এ রুগীর বাড়িতে যায়, তবে তো রুগীর বিছানার পাশে দাঁড়ানো মাত্রই রুগী ভাল হয়ে যায়।

ঝাবু বলল হেসে, বিধানবাবুকে তুই দেখেছিস নাকি গুটলু?

গুটলুও হেসে জবাব দিলো, না। তবে বড় জ্যাঠামশাইয়ের মুখে শুনেছি। মানুষে কল্যাণী, দুর্গাপুর, দীঘা, সল্ট লেকের জন্যেই বিধানবাবুকে মনে রেখেছে, কিন্তু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যে প্রবাদ প্রতিম ছিলেন, তা এই প্রজন্মের ক'জন মানুষ জানে বল?

কল্যাণী, দুর্গাপুর, দীঘা, সল্ট লেকও তো এখন বামফ্রন্ট সরকারেরই কৃতিত্ব। নতুন জেনারেশন বোধহয় জানেও না যে এই সবই বিধানবাবুর অবদান।

গদাই বলল।

মেনকা দূর থেকে সোফাতে বসেই বলল, রোগী তো ভাল হয়। আর রোগিনী? তার রোগ কি সবুজবাবুকে দেখে বেড়ে যায়?

গুটলু বলল, সেই একটা উর্দু শায়ের ছিল না! কার লেখা আমার ওসব মনে-টনে থাকে না। সেই যে শায়েরটি, যার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়, "এমন বৃষ্টি যেন না হয়, যাতে সে আসতে না পারে আমার কাছে। কিন্তু হায় খুদা, সে আসার পরে, যেন এমনই বৃষ্টি নামে অঝোরধারে যেন সে ফিরে না যেতে পারে।" তা আমাদের

সবুজবাবু কোনও 'রোগিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছলে, রোগিনী সম্ভবত সেই প্রার্থনাই করে যে ডাক্তারবাবুর যাওয়াটা যেন বিলম্বিত হয়।

গুটলুর এই কথাতে সকলেই হেসে উঠল।

সবুজের ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসি নয়, হাসির আভাস ফুটে মিলিয়ে গেল।

আমার খুব ভাল লাগল সবুজকে দেখে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। উজ্জ্বল দুটি দরদী চোখ। যেরকম চোখ, ডাক্তারদের থাকলে ভাল লাগে। খদ্দরের সাদা পায়জামা এবং পাঞ্জাবি। বুকে একটি সস্তা বল-পয়েন্ট পেন গোঁজা।

সবুজ বলল, আমাকে কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে, তোদের সকলের পারমিশান নিয়ে।

গুটলু বলল, সেসব হচ্ছে না। আসাটা তোমার ইচ্ছেতে, কিন্তু যাওয়াটা নয়।

তুই একটি রিয়েল কনট্রাডিকশান। এইমাত্র ডাক্তার হিসেবে আমার প্রশংসা করলি, আর ডাক্তারের দায়িত্বটাকে কি অস্বীকার করবি ? একটি পনেরো বছরের মেয়ে মরণাপন্ন, সত্যিই মরণাপন্ন। তার বাবা-মায়ের কোনও সামর্থ্যই নেই যে কলকাতায় এনে নার্সিং হোমে চিকিৎসা করায়। সে-মেয়েটির কনস্ট্যান্ট মনিটরিং দরকার। মনিটরিং মেশিন-টেশিন আর কোথায় পাবে। আমিই তাদের মনিটর। তাকে আমার এক ঘণ্টার জন্যেও ছেড়ে আসাটা আদৌ উচিত হয়নি। তোদের এতোবছর পরে একবার দেখতে পাব এই ভেবেই আসা। দেখাও হল। কত যে পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কম দিন। বল ? চল্লিশ বছর। ভাবা যায় ?

বললাম, কেমন দেখলি ?

কাকে ?

আরে আমাদের সকলকেই।

সবুজ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কোনও কথা বলল না।

গলা নামিয়ে বললাম, না দেখাই ভাল ছিল না কি ?

হেসে ফেলল ও। ওকে ঠিক ছেলেবেলার মতোই সুন্দর দেখাল। এরকম বড় একটা হয় না কিন্তু। এটা বোধ হয় একমাত্র হতে পারে যেখানে ছেলেবেলার আত্মিক সৌন্দর্য সম্ভবত এখনও অক্ষত, অম্লান আছে ওর মধ্যে।

গুটলু বলল, কেন এ-কথা বলছিস ?

সবুজ হেসে বলল, না না। কিছু mean করে বলিনি। এমনিই বললাম।

গুটলু বলল, তুই ঠিক সেইরকমই রয়ে গেছিস পচা। সেই মহা ভুলোরাম। তোকে বলিনি যে, সবুজ তোর আমার মতোই ব্যাচেলর। আর কতবার বলব! সত্যি!

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। সরি।

আমি বললাম।

আমার মনে পড়ে গেল যে, সবুজটা মহা দুষ্টু ছিল ছেলেবেলায়। দোতলার ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে নিচে থুথু ফেলত লোকের মাথায়। অত্যন্ত বাজে ব্যাপার যদিও। ভীষণই খারাপ। ঢিল ছুঁড়ত পথ-চলতি টেকো লোকের টাকে। গুলতি দিয়ে আমাদের স্কুলের পাশের বাড়ির নববিবাহিত দম্পতির শোয়ার ঘরের জানালায় পাথর ছুঁড়ত। বলত, দরজা বন্ধ করে দুপুরবেলাতে কী করে তা দেখব। মাস্টারমশাইদের পেছনে লাগত প্রচণ্ড। উদ্ভট উদ্ভট নাম দিত একেকজন মাস্টারমশাইয়ের এবং জানি না, ওর মধ্যে কী নেতৃত্বের গুণ ছিল, স্কুলসুদ্ধ ছেলে ওর দেওয়া নাম ধরেই সেইসব হতভাগ্য মাস্টারমশাইদের ডাকত।

কারও নাম দিয়েছিল ঢুকচু, কারও বিটকেল, কারও নাম দিয়েছিল কুচকুচ, কারও নেকুপুষু।

অথচ আমাদের সেই নোটোরিয়াস সবুজই, যে প্রত্যেক মাস্টারমশাইয়ের আতঙ্ক তো বটেই, বহু ছাত্রেরও যম ছিল, দারুণ খেলোয়াড়ও ছিল, সেই এখন কত শান্তশিষ্ট, কত আদর্শবান, কত ভাল, দশ টাকা ফিস নিয়ে গরিবদের চিকিৎসা করে। ও একজন আদর্শ ডাক্তার হয়েছে।

সত্যি! জীবন মানুষকে যে কত বদলে দেয়, কে জীবনের কোন মরা সোঁতা থেকে কোন দেবদুর্লভ সুক্ষণে উজ্জীবিত হয়ে জোয়ার পেয়ে সমুদ্রের দিকে বেগে ধেয়ে যায়, আর কোন কূল ছাপানো নদী যে সোঁতা হয়ে মরে যায়, চর ফেলে বিলীন হয়ে যায় তা কে বলতে পারে!

ন্যাকা বলল, পুরনো দিনের সাহিত্যিক শরৎবাবু, তারাশঙ্কর, বনফুল, এঁদের আদর্শবান নায়কদেরই মতো।

আজকাল এই "আদর্শ" শব্দটির মধ্যেই যেন মানুষে একটু যাত্রা যাত্রা গন্ধ পায়।

আমি বললাম, হয়তো দোষ আদর্শের নয়। দোষ আমাদের

নাকের। পচা ও দুর্গন্ধময় জিনিসের মধ্যে থেকে থেকে ফুলের গন্ধের কথা আমরা হয়তো ভুলেই গেছি।

গদাই বলল, আমাদের যে সবুজের মতো একজন বন্ধু আছে, এইটা ভেবেই ভারি ভাল লাগে।

গুটলু বলল, বিয়ে কেন করেনি, সেকথা ওকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। কারণ, ব্যাচেলরকে সেকথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার একমাত্র বিবাহিতদেরই আছে। কাক কাকের মাংস খায় না। তাই আমি আর পচা ব্যাচেলর হয়ে ওকে ঠোকরাতে আমাদের ইচ্ছে নেই।

এবারে ঝাবু বলল, দু'হাতে হাততালি দিয়ে, সকলের অ্যাটেনশান ড্র করে, এবার গুটলুকে নতুন করে পরিচিত করানো দরকার। যার সুবাদে, যার একক প্রচেষ্টায়, আমরা এতজনে আজকে এখানে এসে সুন্দর শৈশবের দিনগুলিতে, কৈশোরের দিনগুলিতে ফিরে যেতে পারলাম।

স্থিতপ্রজ্ঞ মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে, ঝাবুকে জয়েন করে বলল, হিয়ার, হিয়ার।

বললাম, গুটলু, ওরফে শ্রীমান গুণেনচন্দ্র পাইন, ও আমার আর সবুজের মতো ব্যাচেলর, তোমরা নিশ্চয়ই সকলেই জানো। ও একটা ব্যবসা করে। স্টেশনারি দোকান, জানি না হয়তো কিছু এজেন্সিও আছে। মোহনবাগান এখনও তার প্রাণ।

গদাই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওকে আমরা সকলেই ধন্যবাদ দেব এবং ধন্যবাদ ওর ন্যায্যত প্রাপ্য। তবে আমি একটা কথা বলব।

কী কথা? সকলেই ওর দিকে তাকাল উৎসুক চোখে।

গদাই বলল, কথাটা হচ্ছে এই যে, আমি এটা লক্ষ করে দুঃখিতও হয়েছি।

দুঃখ কীসের? আজ আনন্দের দিনে দুঃখ-টুখের কথা আমরা শুনব না। দুঃখ তো আছেই।

গদাই বলল, আমাদের ক্লাসে কিন্তু অনির্বাণ, নৃপতি, পরেশ, হরিপদ, জগৎ ইত্যাদি সহপাঠীরা ছিল। তারাও সকলে কিন্তু কলকাতাতেই আছে।

তাই?

সবুজ জিজ্ঞেস করল।

ন্যাকা বলল, আমি গুটলুর কাছেই শুনেছি যে আছে। গুটলুর সঙ্গে ওদের দেখা-সাক্ষাতও হয়। কিন্তু তারা জীবনে জীবনে তেমন

কিছুই হয়ে ওঠেনি, মানে অর্থকরী দিক দিয়ে। ঠিকই যে, তারা অতি সাধারণ, তাদের বিশেষ কোনও পরিচয় নেই, বিশেষ পেশা নেই, এমনকি কোনও সরকারি অথবা আধা-সরকারি বা বিখ্যাত মার্কেন্টাইল ফার্মে তাদের একটা চাকরি পর্যন্ত হয়নি, সেই কারণেই কি গুটলু তাদের আজকে এই রিইউনিয়নে ডাকেনি ? কিন্তু তারা তো আমাদের কিছু কম বন্ধু ছিল না। আজকে তারাও এলে আমার আনন্দটা আরও অনেকই বেশি হতো। হয়তো তোমাদেরও কারও কারও আনন্দ আরও বেশি হতো নাকি ?

মিলনস্থলে থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কেউ-কেউ একটু বিরক্তও হল স্পষ্টত। কেউ গুটলুর উপরে, কেউ গদাই-এর উপরে।

হঠাৎ ঝাবু এবং স্থিতপ্রজ্ঞ একই সঙ্গে বলে উঠল, দোষটা গুটলুর আদৌ নয়। আমরাই ওকে বারণ করেছিলুম। গুটলু কিন্তু আমাদের ওদের প্রত্যেকের কথাই বলেছিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ? আমাদের মানে কাদের ?

আমরা মানে, আমি আর স্থিতপ্রজ্ঞ।

ঝাবু বলল।

বারণ করেছিলি কেন ? আমাকে বলতেই বা তবে বারণ করিসনি কেন ? আমিও তো ওদেরই মতো সাধারণ। নন-এনটিটি।

দ্যাখ পচা, লেট আস অ্যাকসেপ্ট দ্যা রিয়ালিটি।

গদাই বলল।

তারপর বলল, চল্লিশ বছর আগে আমরা কার সঙ্গে পড়তাম, না পড়তাম, সেটা আজকে জীবনের শেষে এসে রিয়েলিই কি ইমমেটেরিয়াল হয়ে যায়নি ?

ঝাবু বলল, হেমন্ত মুকুজ্যের গাওয়া একটা গান ছিল তুই কি শুনিসনি!

কোন গান ?

"আমার এ পথ, তোমার পথের থেকে গেছে বেঁকে'...না-কী যেন। সেইরকমই এক ক্লাসে, এক স্কুলে পড়লেই যে চিরদিনই প্রত্যেক সহপাঠীর সঙ্গেই সম্পর্ক রাখা যায় বা রাখতে হবে, বা রাখা সম্ভব তার কোনওই মানে নেই। এবং তুই হয়তো জানিসও না যে, চেষ্টা করলেও সে সম্পর্ক রাখা যায় না।

ঝাবু বলল, পয়সাকে অনেকেই বক্তৃতাবাজী করে ছোট করে দেখে। যেন পয়সাওয়ালা মাত্রেই সব বাজে লোক। যেন, খারাপ পথে ছাড়া অর্থ উপার্জন করা সম্ভবই নয়। কিন্তু এটাও আলবাত

সত্যি যে, আর্থিক অবস্থা সমান সমান না হলে কোনও বন্ধুত্বই টেকে না।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল, তুই গুটলুকে এ কথা বললি বটে, কিন্তু অনির্বাণ, পরেশ ও অন্যদের কেন যে ও বলেনি বা আমরাও বলতে বলিনি তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যুক্তিটা কী ?

যুক্তিটা খুবই সিম্পল। সেটি হচ্ছে এই যে, ডিফারেন্ট আর্থিক অবস্থার বন্ধুদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হলে হৃদয়ের ঔদার্য অনেকই বেশি লাগে, যাদের অবস্থা খারাপ, তাদেরই।

কেন ? তা বলছিস কেন ?

যাদের অবস্থা খারাপ, তাদের মনে হাজারো রকমের কমপ্লেক্স থাকে, সেই জন্যেই বলছি। তা ছাড়া দু'দিন পরে সেই "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"-এরই মতো বন্ধুত্বের মুখগুলি খুলে পড়ে যায়। তাদের নগ্ন স্বার্থের মুখোশগুলি প্রায়ই প্রকট হয়ে ওঠে। তারা কেবলই দাও, দাও, দাও, করতে থাকে। দিতে হয়তো আমরা যারা ওয়েল-অফফ তাদের কারওই অসুবিধে নেই। বন্ধু বন্ধুকে দিতে চায়ও। দেবে না কেন ? কিন্তু দিতে দিতে একটা সময় আসে, যখন দিতে অসুবিধে হয়, দেওয়া বন্ধ করে. দেওয়া মাত্রই সেই প্রাণের বন্ধু যে কী কুৎসিৎ, কী ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ মূর্তি ধারণ করে, তা যার দেখা আছে, সেই-ই জানে।

আমি বললাম, যা ঘটেছে, সেটা নিঃসন্দেহে দুঃখের কিন্তু যাই হোক, এই নিয়ে আজকে আর আলোচনা না করাই ভাল।

ঝাবু বলল, আজ এটাই শুধু তোকে আর গদাইকে বলব পচা, যে গুটলুর কোনওই দোষ ছিল না। গুটলু বারে-বারেই বলেছিল, দ্যাখ, সকলকেই বলি, তা হলেই মজা হবে। তা ছাড়া, ওরা কেউ জানতে পেলে কত দুঃখ পাবে। ওদের সঙ্গে আমার এবং পচার মাঝে-মধ্যে দেখাও হয়ে যায়। যেমন নেড়ু, যেমন পরেশ!

ওরা কে কী করে ?

ঝাবু জিজ্ঞেস করল।

গুটলু বলল, অনির্বাণ এক অফিসের পিওন। অথচ ও-ই ক্লাসে ফার্স্ট হতো, মনে আছে।

কেন এমন হল ?

ন্যাকা বলল।

ওর বাবা মারা গেলেন কলেজে ভর্তি হবার পরই। মনে নেই ?

আমরা কেউ-কেউ তো শ্মশানেও গেছিলাম। তারপর ওর কাকারা তাড়িয়ে দিলেন ওর মাকে আর ওকে। তখন এরকম আকছারই হত। তবে ওর দোষ কি ? ওর বড়লোক বন্ধুও তো কম ছিল না ? আমরা কি করেছিলাম ওর জন্যে ?

দোষগুণের কথা হচ্ছে না। বাসটা মিস করে গেছিল ও। হি মিসড দ্যা বাস। ব্যাড লাক। এই পর্যন্ত। এতে অন্যের দোষ গুণের কি আছে ?

ঝাবু আমাকে বলল, তুই কি ভাবিস পচা যে, আজকে যে পরেশ বারোশ টাকা মাইনের একটা চাকরি করে, ছেলে-মেয়ে বউ নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে থাকে, সে আজ সকালে আমার এই জমকালো শ্বশুরবাড়িতে এসে আদৌ কমফর্টেবল ফীল করত ? স্কুলের বন্ধুদের সাচ্ছল্য দেখে, তাদের কেউ-কেটা হতে দেখে আহ্লাদে ডগমগ করত ? বুলশিট ! আনন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য। একজন মানুষ, সে যেই হোক, যেখানে যাবে, যাদের সঙ্গে মিশবে ; সেখানে সে নিজে যদি স্বচ্ছন্দই বোধ করতে না পারে, তবে তাকে এনে তো পীড়া দেওয়াই হত। তুই মানবি কি-না জানি না, কিন্তু পরে কথাটা ভেবে দেখিস।

আমি চুপ করেই রইলাম। ওদের যুক্তিটা মানতে পারলাম না। পরেশ, অনির্বাণ এলেই কি আর ঝাবুদের কাছে ধার চাইত ? না ছেলের চাকরি চাইত ?

আমি ভাবছিলাম, পরেশের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় আমার। দেখা হলেই বলে, পচা, তোর খেলার লাইনে যাওয়া উচিত ছিল। আজ তাদের রবরবা দেখেছিস। সেই যে তুই হেয়ার স্কুলের বিরুদ্ধে সেমিফাইন্যালে আমার পাস থেকে হেড দিয়ে গোলটা করেছিলি ! আজও মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি। মারাদোনার বাপ। সত্যিই আমাদের লাইন চ্যাঞ্জ করাই ভুল হয়ে গেছে। হয় খেলা, নয় সিনেমা, কী প্লে-ব্যাক সিঙ্গার নিদেনপক্ষে ব্যবসা-ট্যাবসা করা উচিত ছিল। শালার পানের দোকান করলেও ভাল হত। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

তোর ছেলে-মেয়ে কী ?

পরেশ বলেছিল, এক ছেলে ছিল। এবং এক মেয়ে।

ছিল মানে ?

ছিল মানে, পঁচিশ বছরের ছেলেটা গত বছরে আত্মহত্যা করে মরল। কাগজে দেখিসনি ? বি.এ। ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি না পেয়ে, বাপের কষ্ট সহ্য করতে না

পেরে সার্কুলার রেলের নিচে মাথা দিল। ফিলসফার ছেলে আমার। মেয়েটা নাইনে পড়ে। রিটায়ারমেন্টেওর সময় হয়ে এল।

পরেশের কথা মনে হতেই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল।

গদাই বলল ঘরের কোণা থেকে, পচাটা কি কম্যুনিস্ট হয়েছে নাকি রে গুটলু?

কিন্তু গদাইয়ের কথাতে কেউই হাসল না। পরিবেশটা তেতো হয়ে উঠেছিল, হয়তো আমারই জন্যে।

আমিও লজ্জিত হলাম কম নয়। আমাদের অনেকের বক্তব্যই আমরা গুটলুকে আলাদা করে ডেকে বলতে পারতাম। তা না বলে, এত জনের সামনে, স্ত্রীদের সামনে, এমন সব অপ্রিয় প্রসঙ্গর অবতারণা করাতে এই আনন্দোজ্জ্বল সকালবেলার সুরটাই কেটে গেল। আনন্দও তারের বাজনা। একটা তার বেসুরো হয়ে গেলে আর সুরে বাজে না।

কথা ঘুরিয়ে, পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে ঝাবু বলল, তুই কি খাবি পচা? বিজলী গ্রীলকে বলা হয়েছে। ব্রেকফাস্ট রেডি। ফুলকো লুচি, ঝাল-ঝাল আলুর তরকারি, ফালি-ফালি বেগুন ভাজা আর কুমড়োর ছেঁচকি আর মোহনভোগ। এ তো খাবিই। তার পরে কী খাবি তাই বল?

ঝাবুর স্ত্রী মন্দিরা ভিতর থেকে এসে গলা তুলে সকলকে বলল, চলুন, এক্ষুণি না এলে লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল, লাঞ্চ-এর আগে কে কী খাবে বলো। কার কী ড্রিংকস?

আমি বললাম, আমি খাই না। একদিন বিয়ার খেয়েছিলাম। চিরতার জলের মতো তেতো তেতো লাগে। ভাল লাগে না। তাছাড়া এসব খাওয়ার সামর্থ্যও নেই।

কোনও শুচিবায়ুও তো নেই। ন্যাকা বলল।

তা নেই। তা তোরা কে কি খাচ্ছিস?

স্থিতপ্রজ্ঞ আমাকে বলল, তুই তো মহা ন্যাকার মতো কথা বলছিস?

ন্যাকা বলে উঠল, এই, আমার নাম করে কোনও কথা বলবি না স্থিত।

সরি, সরি।

বলে স্থিতপ্রজ্ঞ হেসে উঠল।

বললাম, কেন, ন্যাকার মতো কথা কেন? খাবি তুই, তার সঙ্গে

আমরা কী খাব না খাব, তার কি সম্পর্ক, মদ খাই না তাই ন্যাকা হয়ে গেলাম। তোরা যখন খাবি, তখন দেখা যাবে। ব্রেকফাস্ট তো খাওয়া হোক।

ক'টা বাজে দেখেছিস? সাড়ে-দশটা।

ওরকম হয়ই। রিইউনিয়ন বলে ব্যাপার!

ঠিক আছে। আমি একটা জিনই খাব। লেবু দিয়ে।

গুটলু বলল, বিয়ারই না-হয় খাস। অভ্যেস-টভ্যেস নেই, শেষকালে মাথায় জিন-ফিন চড়ে গিয়ে তোর মস্তিষ্কের কোন জিনকে যে অ্যাটাক করবে কে বলতে পারে?

বললাম, না রে। বিয়ারেও বড় আই ঢাই লাগে। মনে আছে? একবার দেশবন্ধু পার্কে পাড়ার হাবুদা ফুচকা খাওয়ার কমপিটিশান করেছিল। আর স্থিতপ্রজ্ঞ আড়াইশো ফুচকা খেয়েছিল! আমার তো ভাই ভটচাজ বামুনের পেট নয়, স্থিতপ্রজ্ঞর মতো যে, ঈশ্বর কাস্টম-বিস্ট করে বানিয়েছেন। ওই টিঙটিঙে শরীরের পেটে কী করে যে অত ধরে! আমার পেটটা ভর্তি হয়ে গেলে আর কিছুই খেতে পারব না।

সকলেই আমার এই কথাতে হো হো করে হেসে উঠল।

আমি ভাই মেয়েদের দলে।

তুই তো চিরদিনই মেয়েদেরই দলে। নতুন কী! তবে মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ খাবে।

তাই?

আজকাল তো এ সব দোষের নয়। ছেলেতে-মেয়েতে তফাত কি আছে?

তারপরেই বলল, তবে জানিস তো, এই গরমের দেশে, বিশেষ করে গরমের দিনে, যখন তুই ট্রাভেল করছিস, গাড়িতেই কর কী সাইকেলেই কর, কী হেঁটেই কর, বিয়ার অনেক সময়ে ওষুধের মতো কাজ করে। আমি যে কতবার সান স্ট্রোক হতে হতে বেঁচে গেছি দু-এক বোতল বিয়ার খেয়ে সে কী বলব!

সবুজ বলল, বিয়ার না খেয়ে যবের ছাতু জলে গুলে খেলেও হয়। যত্ত বাহানা। খেতে ইচ্ছে হয় খাবি। অত এক্সপ্লানেশান কীসের? তবে বিয়ার কিন্তু সত্যি সত্যিই কখনও কখনও ওষুধের কাজ করে।

সুশান্ত বলল, ডাক্তারি করতে করতে ওসব খাস? পেশেন্টরা তো অফেন্ডেড হতে পারে।

সবুজ বলল, আরে পেশেন্টরাই তো খাওয়ায়। তা ছাড়া, আমার তো সবই গরিব-গুরবো পেশেন্ট। তবে মদের কালচার সেলুনের কালচার, ভিডিও পার্লারের কালচার, এ সব তো আজকাল গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে গেছে। আমার সম্বন্ধে আমার পেশেন্টদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আমাকে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদে টু হানড্রেড পার্সেন্টি অ্যাকসেপ্ট করেছে। তাদের কাছে আমি ভগবান। আমি বড়লোক না হতে পারি, কিন্তু জীবনে মানুষ হয়েও জীবদ্দশাতেই ভগবান হওয়াটা বড় কম প্রাপ্তি নয়। বল ? আমি অতি সাধারণ, এমনকি আমাকে তোরা ভূতও বলতে পারিস, কিন্তু ভূতের পক্ষে এই ভগবানের পোশাক পরে থাকাটা একটা আশ্চর্য অনুভূতি নয় কি ? এই অনুভূতি, সত্যিই বলছি, আমার মতো সাধারণ মানুষকেও আমার মাপের চেয়ে অনেকই বড় করে তোলে, অনেক সময়ে। তোরা সুখ বলতে যা বুঝিস তেমন সুখী হতে ইচ্ছে যে করে না এমন নয়। তবে কী জানিস, সংসার-সুখ, বিশেষ করে দাম্পত্য সুখ পেতে হলে হয় সাধারণ হতে হয়, নয় স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই একে অন্যের হান্ড্রেড পার্সেন্টি পরিপূরক হতে হয়। সেটাও শুধুমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদেই সম্ভব। তোরা সবাই আমা-হেন ব্যাচেলরের এই সব অবসারভেশান অবশ্য মানবি কি না জানি না। বুঝলি, সেই অদৃশ্য পোশাকটাই আমাকে সাধারণ হতে দিলো না, সুখী হতে দিলো না। মানে, সুখ বলতে তোরা সকলে যা বুঝিস। এই মিথ্যে বড়ত্ব সংসারী হতেও দিলো না। তা ছাড়া, এত তো আর বিবেচনার সময়ও নেই। সে সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করল সবুজকে, মুর্শিদাবাদ জেলার যে গ্রামে তুই প্র্যাকটিস করিস সেটা বহরমপুর শহরের কোন দিকে ?

কোন দিকে বললে কি তুই বুঝবি ? আখরিগঞ্জের নাম শুনেছিস ?

ওই যেখানে পদ্মার ভাঙনে গ্রাম প্রায় তলিয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

তারই কাছে। তবে আমার রোগী তো শুধু এক গ্রামে নেই—আমার ডেরাটা আখরিগঞ্জ আর বহরমপুরের মাঝামাঝি। তবে রোগীরা আসে বহু দূর দূর গ্রাম থেকে। যাদের আসবার মতো অবস্থা থাকে না তাদের আমিই যাই দেখতে, আমার ফটফটি সাইকেলে।

ভাল লাগে ওই গণ্ডগ্রামে পড়ে থাকতে ?

খুব ভাল লাগে রে সুশান্ত। গ্রামই তো আসল ভারতবর্ষ। এখনও অনেক সবুজ আছে, অনেক ভালবাসা, বাঁশঝাড়, বট অশ্বত্থ

গাছ, পদ্মার রূপ, একেক ঋতুতে একেক রকম। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ ওই নদীতে পড়ে থাকতেন।

পদ্মা তো নদী নয়, নদ।

ওই হল। পদ্মার ব্যক্তিত্বতে যে একবার মুগ্ধ হয়েছে সে আর দূরে যেতে পারে না। সমুদ্রের মধ্যে তো কখনও যাইনি, তাই কেমন লাগে তা বলতে পারব না। হয়তো মধ্যে থেকে দেখলে তার ব্যক্তিত্বও অন্যরকম ঠেকবে। তবে পাড় থেকে দেখলে, পদ্মার মতো নদীর ব্যক্তিত্ব মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। অবসর সময়ে, মানে যখন রোগ-মারী কম থাকে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদ্মার পাড়ে বসে কাটিয়ে দিই। মনের মধ্যে কতরকম যে ভাবনা জাগে কী বলব তোদের।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানিস!

কি?

একা থাকার, একা ভাবার অভ্যেস আধুনিক মানুষের একেবারেই মরে গেছে, তার জীবন হয়ে গেছে প্রকৃতি-বিবর্জিত তাই মানুষ হিসেবে এত ও এতরকম অবক্ষয় আমাদের গ্রাস করছে। এর ফল কিন্তু আদৌ ভাল হবে না দেখিস তোরা। দলে দলে তোরা যখন গ্রামে ফিরবি, প্রকৃতিতে, মায়ের কাছে, তখন মায়ের সবুজ কোল বলে কি আদৌ কিছু থাকবে আর? জানি না!

একা লাগে না তোর? বিয়ে করিসনি। আত্মীয়-পরিজন নেই।

আত্মীয়-পরিজন আমার নেই তো কার আছে? আমার রোগীরাই তো আমার পরমাত্মীয়। কত মা, কত বোন, বাবা, দাদা, ছোট ভাই, ছোট বোন—তাদের ভালবাসা শ্রদ্ধা স্নেহের দাম দিই, এমন ক্ষমতা কি দশ জীবনেও হবে!

আর প্রেমিকা নেই?

মিথ্যে বলব না। আছে। তবে একজন নয়, অনেক। প্রতি পরিবারেই একজন করে প্রেমিকা। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস...

সবুজ, তারপরেই আত্মমগ্ন হয়ে বলল, প্রায় স্বগতোক্তিরই মতো, মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানিস? সেই একটা গল্প ছিল না, ব্যাধের গল্প? ব্যাধের ধারে-কাছে পাখি আসে না, ব্যাধের ভারি দুঃখ, মারবে কি করে? তাই ব্যাধ একদিন সন্ন্যাসী সেজে জঙ্গলের মধ্যে এক শুকনো নদীরেখার উপরে জোড়াসনে বসে রইল। প্রথমে একটা-দুটো করে পাখি, আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে তার কাছে আসতে

লাগল। তারপর একটি-দুটি করে পাখি তার হাতে, কোনও কোনও পাখি তার মাথায়, কোনও পাখি তার কাঁধে এসে বসতে লাগল। নিঃশঙ্ক পাখি-পরিবৃত ব্যাধের তখন আর তাদের ধরবার কি মারবার প্রবৃত্তিই রইল না। ধরতে কি মারতে, তখনই হয়তো ইচ্ছা থাকে মানুষের, যখন তার প্রার্থিত চাওয়াগুলো অপূর্ণ থাকে, দূরে থাকে। কিন্তু ধর, যেসব জিনিসের বা প্রাপ্তির জন্যে আমার তোর অনন্ত বাসনা, উদগ্র কামনা, সেই জিনিসই যদি নিঃশর্তে আপনা হতেই তোর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে, তোর অন্তর-বাহির যদি সেই সব পাওয়াতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ; তখন বোধহয় মানুষের মনের মধ্যে থেকে লোভ এবং সমস্ত চাওয়াই অন্তর্হিত হয়ে যায়। এক অদৃশ্য পাওয়ার আনন্দে তখন সে সব সময়েই ভরপুর হয়ে থাকে।

তারপরে সবুজ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কথাগুলো হয়তো বক্তৃতার মতো শোনাল এবং আমি হয়তো ঠিক করে বলতেও পারলাম না, কিন্তু ন্যাকা, যে অধ্যাপক কিংবা গুটলু বা তুই বা তোরা অথবা মেনকাও হয়তো জিনিসটাকে সুন্দর করে বলতে পারতিস, বোঝাতে পারতিস। কিন্তু আমি যেটা বললাম, সেটা আন্তরিক কথা। সাজিয়ে-গুছিয়ে বললাম না, বলতে পারিও না। যার যেরকম মনে হয় সেরকম করে বুঝে নিস।

লিখতে তো পারিস। কে যেন বলে উঠল। 'আমার কথা' বলে একটা বই লিখে ফেল।

চেষ্টা করলে হয়তো পারি কিন্তু ডাক্তারদের হাতের লেখা কেমন হয় তা তো জানিস। আগেকার দিনের কম্পাউন্ডারেরা ছাড়া আর কারও পক্ষে তো তা পড়াই সম্ভব ছিল না।

মন্দিরা হেসে বলল, সত্যি! আমার ব্যবসায়ী মামাবাবুর যিনি মুহুরি ছিলেন তাঁর হাতের লেখাও তিনি নিজে ছাড়া কেউই পড়তে পারতেন না। তিনি অসুস্থ থাকলে ইনকাম-ট্যাক্সের কেস করতে পারতেন না হাকিম।

গুটলু বলল, ওসব ইচ্ছাকৃত পুরোপুরি। নিজেদের ইমপর্ট্যান্স যাতে কমে না যায়, তাই ওরকম করতেন পুরনো দিনের মানুষেরা। পাছে অন্য ডাক্তারে ভুল ধরে ফেলেন প্রেসক্রিপশানের, হয়তো তাই ইচ্ছে করেই দুর্বোধ্য করতেন লেখা। অন্য মুহুরিই যদি তাঁর লেখা পড়তে পারেন তাহলে তো তার চাকরি যেতে সময় লাগবে না।

বাঃ। সবুজ তো দেখছি ডাক্তারি না পড়ে পলিটিকসে গেলেও পারতিস। বলা-কওয়া তো ভালই শিখেছিস।

বলেই, ঝাবু নিজের রসিকতায় নিজেই বিমোহিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল।

এমন সময় ঝাবুর স্ত্রী মন্দিরা, যে একটু ভিতরে গেছিল, সে এসে আবারও বলল, এবার একটু বিরক্ত হয়েই, ব্রেকফাস্ট যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল। খাবেন তো একেবারে ভেতো-বাঙালি ব্রেকফাস্ট। এরকম করলে হয়! প্লিজ...

তারপর বাঁ হাতটি লম্বা করে ডাইনিং-রুমে যাওয়ার জন্যে সকলকে নির্দেশ করল।

মন্দিরার ওই বলার ভঙ্গিমার মধ্যে এটা প্রচ্ছন্ন রইল না যে, আজকে ঝাবু-মন্দিরার জন্যেই আমরা ভাল-মন্দ খাব-দাব, সারাদিন ভাল করে কাটাব।

কিছু কিছু মানুষ হয়তো থাকেন, যাঁরা পরম ভাগ্যবান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের ভেতরের দৈন্যটা তাঁদের সমস্ত প্রাপ্তি দিয়েও ঢাকতে পারেন না। ছাই চাপা আগুনের মতোই সেটা ভেতরে থেকেই যায়। হাওয়ায় ছাই একটু সরে গেলে, নড়ে গেলেই, সেই আগুনেব জিভ লকলক করে ওঠে।

॥ ৭ ॥

ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। সকলে মিলে এখন বসার ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। তবে ছেলেরা-মেয়েরা আলাদা আলাদা নয়। যার যেখানে খুশি বসেছে।

আমি বসে ওদের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম যে আমার বন্ধুরা আজকের নানারকম মোড়কে নিজেদের মুড়ে রাখলেও ছেলেবেলাটাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি কেউই। বিদ্যা, অর্থ, দম্ভ অথবা বিনয়, এই দীর্ঘ ব্যবধানে যে যাই আয়ত্ত করে থাকুক না কেন তারা অনেকখানিই সেইরকমই আছে।

ঝাবু কথা বলার সময়ে অথবা নীরবে যখন মাস্টারমশায়দেব পড়া বা বলা শুনতো তখন মাঝে মাঝেই এক অদ্ভুত প্রক্রিয়াতে তার ঘাড়টা ঘোরাতো—ডানদিক থেকে বাঁদিকে—কখনও বাঁদিক থেকে ডানদিকে নয়। এখনও ওর সেই মুদ্রাদোষ আছে। তবে অত ঘন ঘন করে না ওরকম।

গদাইরা একবার পুজোর সময়ে মধুপুরে বেড়াতে গেল ওর মায়ের এক বড়লোক বান্ধবীর সঙ্গে। কোথায় চেঞ্জ করতে গিয়ে মোটা হয়ে

ফিরবে, তা নয়, রোগা হয়ে ফিরলো। আমরা সেই কথা বলতে বলল, কী বলব তোদের, কুয়োর জল তো নয়, পাথর হজম করানো জল। তা আমার পেটে ছিল কি বল ? পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে গেল।

খাকি হাফ-প্যান্ট আর খাকি শার্ট পরে আসতো গদাই। তখন আমরা প্যান্ট বা প্যান্টুলুন বলতাম। আজকালকার মতো ট্রাউজার, ড্রেইনপাইপ, ব্যাগী, জিনস ইত্যাদির বাহার জানা ছিল না। তখনও কলকাতা এবং তাবৎ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি জামা-কাপড় সেলুন, টি.ভি. ভি.ডি.ও ছিল না। আমরা শিশু হিসেবেও অনেক অর্ন্তমুখী, "প্লেইন লিভিং হাই-থিংকিং"-এ বিশ্বাসী ছিলাম।

মধুপুর থেকে ফিরে গদাই-এর পেন্টুলুন ঢিলে হয়ে গেল। সবসময়েই কোমর থেকে খসে যেতে চাইত আর গদাই বাঁ হাত দিয়ে তাকে টেনে তুলত বারে বারে। ডান হাত দিয়ে কেন নয়, তা বলতে পারব না।

আজ তো গদাই-এর কোনও অভাবই নেই, ট্রাউজারের অভাব তো নয়ই। তবু এখনও দেখলাম মাঝে মাঝেই ও ওর চমৎকার ফিটিং-এর ট্রাউজারও বাঁ হাত দিয়ে ওপরে টানছে। মনে হল, একেই বলে, ওল্ড হ্যাবিটস ডাই হার্ড।

ন্যাকাটা, ন্যাকার মতো নিজের নিচের ঠোঁটটা জিভ দিয়ে বুলোতো, যেমন করে বেড়ালনি বেড়ালছানার গা চাটে। তাতে তার ফুলো ফুলো লাল-রঙা ঠোঁটটি আরও লাল হয়ে উঠত।

সুশান্তর ছিল আর এক মুদ্রাদোষ। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বুড়ো আঙুলকে খুব আস্তে আস্তে পরম যতনে ঘষত। ওর যখনই কিছু ভাবতে হত, অথবা ও যখন একা থাকত তখনই ওরকম করত। স্পষ্ট মনে আছে, পরীক্ষা দিতে বসে, সামনে পরীক্ষার খাতা এবং প্রশ্নপত্র নিয়ে ও ওরকম করতো—দু এক মিনিট ওরকম করার পরেই খাতা টেনে নিয়ে উত্তর লেখা আরম্ভ করত।

স্থিতপ্রজ্ঞ বা থিতুর গলাতে একটি সোনার হার ছিল। ওরা ছিল স্বর্ণবণিক। হারের সঙ্গে একটি কালীমূর্তি ছিল লকেটে। ও যখন-তখন লকেটটি তুলে নিয়ে নাকে ঘষত। গুটলু ওর নাম রেখেছিল তাই কালিঘষা। আশ্চর্য! আজও থিতুর সেই অভ্যেসটি যায়নি। তবে লকেটে কালীমায়ের মূর্তি নেই, আছে শ্রীশ্রীসত্য সাঁইবাবার।

আমার খুব মজা লাগছিল এইসব লক্ষ করে।

গুটলু খুব ভাল খেলত ফুটবল। লেফট উইঙ্গার ছিল। পায়ে খুব জোরাল শট ছিল। ও তাড়াতাড়ি হাঁটাতে মাঝে মাঝে ডানদিকে ঘুরে যেত, যেন পায়ে বল পেয়েছে এখুনি গোলে শট করবে। গুটলুর সেই মুদ্রাদোষ যে যায়নি তা দেখলাম ও যখন খুব তাড়াতাড়ি ঝাবুর মস্ত বাড়ির করিডরে কিংবা এঘরে ওঘরে যাওয়া-আসা করছিল।

জানি না, আমারও নিশ্চয়ই ওরকম কিছু মুদ্রাদোষ ছিল। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আজও আছে কি-না তা লক্ষ করে থাকবে।

ঝাবু বলল, বুজলি, গতবার দেশে এসে শিলং গেছিলাম, শ্বশুরবাড়ির সবাইকে নিয়ে। পাইনউড হোটেলে ছিলাম, ওয়ার্ড লেক-এর পাশে। আঃ কী হোটেল! ব্রেকফাস্ট খেলে লাঞ্চ খাওয়ার জায়গা থাকে না। লাঞ্চ খেলে, ডিনারের।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল, এখন আর পাইনউড-এর আছেটা কি? আমি যখন প্রথম ওখানে কনস্ট্রাকশানের কাজ নিই, তখন এক মেমসাহেবের ছিল হোটেলটা। কী ম্যানেজমেন্ট! এখন তো কলকাতাব গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলেরই মতো সেখানে ছুঁচোর কেত্তন হয়। নোংরা, অ্যারোগেন্ট বেয়ারারা, খাওয়া-দাওয়ার কোয়ালিটি বাজে হয়ে গেছে। গভর্নরস হাউসের চারপাশে হেঁটে বেড়াতাম—ওয়ার্ড লেক-এ, শিলং ক্লাব-এ টেনিস খেলতাম—তখন তো আর সেখানে ঢাউস বিল্ডিং হয়নি। ছোট্ট ক্লাব রুম ছিল কাঠের।

ঝাবু খুব নিষ্প্রভ হয়ে গেল স্থিতপ্রজ্ঞর কথা শুনে। ভাবখানা এমন, যেন পাইনউড হোটেল অথবা শিলং শহরটা যেন ঝাবুরই পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, এখন স্থিতপ্রজ্ঞই তা হাতিয়ে নিল। ঝাবু যেন ইজ্জতহারা হয়ে গেল স্থিতপ্রজ্ঞর কাছে।

তারপর, নিজের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যেই বলল ও সম্ভবত; গতবছরের আগের বছর গেছিলাম মুসৌরিতে। হ্যাকম্যান-এ ছিলাম।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল, হ্যাকম্যান? সেটা তো টু-স্টার হোটেল হবে। আমি ছিলাম স্যাভয়-এ। আমি তো গেছিলাম গত বছরের আগের বছরে। চমৎকার হোটেল—অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যা ডিন অ্যান্ড বাসল অফ দ্যা ম্যাল। উটির স্যাভয়ও চমৎকার। একটা এয়ার-কন্ডিশানড কন্টেসা নিয়ে গেছিলাম। ড্রাইভারটাও চমৎকার ছিল। কী যেন নাম?

ঝিনি বলল, ঝাভু সিং।

হ্যাঁ হ্যাঁ। ঝাভু সিং। সত্যি, মনেও থাকে তোমার ঝিনি।

ঝাবু যেন হেরে গেল। স্থিতপ্রজ্ঞর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে বলল, উটির এখনকার নাম তো হয়েছে উধাগামন্ডলম। তাই না?

হারতে হারতেও হারবে না ঠিক করে ঝাবু বলল।

তারপর নতুন উদ্যমে বলল, মাস ছয়েক আগে স্টেটস থেকে ইংল্যান্ডে এসে নর্ডিক কান্ট্রিজ-এ ঘুরে এলাম। ফিয়র্ড-এর দেশ। সূর্য ডোবে না। ফ্যান-টা-স-টি-ক!

স্থিতপ্রজ্ঞ ঝাবুকে পাত্তা না দিয়ে বলল, মাস তিনেক আগে ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে যে নতুন টানেল হয়েছে তা দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে ঘুরে এলাম। আগে কী হ্যাপাই না ছিল। বোটে করে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে গা গোলাত। সি-সিকনেসে কাত হতো সিক্সটি পার্সেন্ট প্যাসেঞ্জার। বিশেষ করে মেয়েরা। লেডিজ টয়লেটের সামনে সে কী করুণ দৃশ্য!

গদাই বলল, তোরা কেউ 'লংগেস্ট ডে' ছবিটা দেখেছিলি? DARRYL B ZANUK -এর? আজকে যদি ফ্রান্সে ইনভেশান করতে হতো তো চ্যানেলের তলার টানেল দিয়ে কত সহজে ট্রুপ মুভমেন্ট করতে পারত অ্যালায়েড ফোর্সেস! বল?

গুটলু আমার কানে কানে বলল, শালা গদাই যেন জেনারাল আইজেনহাওয়ার।

আমি সত্যিই স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ঝাবুর উপরে বিরক্ত হয়ে বললাম, গুটলু তুই কখনও জয়নগর মজিলপুরে গেছিস? অথবা মসলন্দপুরে? জাপানিরা যখন বোমা ফেলল কলকাতাতে, যদিও মাত্র চার-পাঁচগাছি বোমাই ফেলেছিল বেঁটেরা কিন্তু তাতেই বড় জ্যাঠামশায় আমাদের সবাইকে লক-স্টক-অ্যান্ড ব্যারেল মসলন্দপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সকলকে মানে?

সকলে মানে মেয়েছেলে আর বাচ্চাদের।

মেয়েছেলে আবার কী অসভ্যর মতো কথা।

কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে ফুট কাটল!

আহাঃ, কী সুন্দর জায়গা রে! সবুজ মাঠ, কাশ ফুল, ঘুঘুর ডাক, শান্তি, কী শান্তি।

আমি বললাম।

ঝাবু বলল, স্কটল্যান্ডে যদি কখনও যেতিস তো দেখতে পেতিস পচা, সবুজ কাকে বলে!

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল, কেন? আমার ইংলিশ কান্ট্রিসাইডের সবুজও

ভাল লাগে। অধিকাংশ কান্ট্রির সাবাবই চমৎকার।

গুটলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, রিইউনিয়নের বন্দোবস্ত করেছিল গুটলু পুরনো দিনের কথা হবে, মজার মজার ঘটনার কথা বলবে একে অন্যকে এই সব ভেবে। আমাদের ক্লাসরুমটাই যেন উঠে আসবে আজ সকালে এখানে। তেমনই ভেবেছিল। অথচ এ কী বড়লোকদের আর সবজান্তাদের লড়াই শুরু হল!

বিরস মুখে বসে রইল গুটলু।

আমি বললাম, চূর্ণীর পাশের শ্রাবণের মাঠের মতো সবুজ কি আর কিছু আছে। মোদো মিঞার লাল বেতো ঘোড়াটা চরে বেড়াত। ফড়িং উড়ত বৃষ্টির পরে! নিজের দেশের মতো দেশ আছে? বল গুটলু?

সবুজ বলল, তোমাদের লাঞ্চ হবে কখন?

হলেই হল। তবে সব পদ রাঁধা হলে তবেই তো খাবে।

কেন? বললে তো বিজলী গ্রিল। তাঁরা তো সব রেঁধেই আনেন!

না। ওঁদের স্পেশাল রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যে, এখানেই রাঁধবেন।

তা রান্না হবে কখন?

ধরো, তাড়াতাড়ি হলেও তিনটে। সব দিশি পদ তো!

ঝাবু বলল।

একটাতে আমাকে উঠতে হবে। এখান থেকে বাঙুর, তারপরে এসপ্লানেডে গিয়ে বহরমপুরের বাস ধরতে হবে। একটাতে না বেরোলে চলবেই না। তা ছাড়া আমার খিদেও নেই। যা ব্রেকফাস্ট খাওয়ালে ভাই।

কেন? লালগোলা না ভাগীরথী কি যেন আছে না? কী নাম যেন ট্রেনটার?

ন্যাকা বলল।

তারা সবাই মহারথী।

সবুজ বলল।

সত্যি! এত বছরেও ওই লাইনে একটা ফাস্ট-ট্রেন হল না!

কী করে হবে? ওদিক থেকে তো কোনও মন্ত্রী বা নিদেনপক্ষে ক্ষমতাবান এম.পি-ও হননি বহুদিন। ইলা পালচৌধুরী কি আজকের?

আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসারাইজ করে না কেন?

হ্যাঁ। স্টেট গভর্নমেন্ট তো সবকিছুই প্রেসারাইজ করে করাচ্ছেন কেন্দ্রকে। ওড়িশাতে দ্যাখ, রোজ নতুন লাইন বসছে, নতুন স্টেশন। সাউথ ইস্টার্ন রেলের পারফরমেন্সও খুব ভাল। তাদের রাজ্যের মন্ত্রীরাও তাদের রাজ্যের প্রতি দরদ রাখেন, কেন্দ্রের মন্ত্রীরাও রাখেন। কত বাঙালি কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব করে গেলেন, এখনও তো করছেন ; তাঁরা পশ্চিমবাংলার জন্যে কে কী করলেন। যত্ত বোগাস!

তা ঠিক। গদাই বলল।

সবুজ, তাড়া করিসনি ভাই। কতবছর পরে দেখা হল। তোর রোগিনী মরবে না। এত জনের শুভেচ্ছা আর প্রার্থনার দাম নেই একটা ?

ঝাবু বলল, আর বাসে বা ট্রেনে মরতে যাবি কোন দুঃখে। এতগুলো গাড়ি পড়ে আছে, তুই খেয়ে দেয়ে, ধীরে সুস্থে একটা গাড়ি নিয়ে চলে যা বহরমপুরে। ইসলাম ড্রাইভার আছে—সে তোকে চার ঘণ্টাতে পৌঁছে দেবে আমার নতুন মারুতি এস্টিম গাড়িতে।

ইসলাম-এর বাড়ি কি ইসলামপুরে ?

না রে। ওর পুরো নাম নজরুল ইসলাম। আমাদের বদ্দমানের জমিজমা দেখত অছিমুদ্দি,তারই বড় ছেলে। ন' ছেলের মধ্যে এই বড়। ভারি ওবিডিয়েন্ট আর এফিসিয়েন্ট ড্রাইভার। ও শ্বশুরমশাইয়ের নিজস্ব গাড়ি চালায়। বহরমপুরে সাহেব-সুবোদের পৌঁছতে যায় প্রায়ই। পথও চেনে। প্রয়োজনে পা টিপে দেবে, আবার রান্নাও করে দেবে। ইসলাম-এর মতো খিদমদগার বড় একটা দেখা যায় না। গ্রেড ওয়ান, এ ওয়ান।

সবুজ বলল, আমাকে ছেড়ে দে ঝাবু। গরিবের ঘোড়া রোগ। চড়ি মোটরাইজড-সাইকেল, তার মারুতি এস্টিমে চড়ে সেখানে গিয়ে সেই গণ্ডগ্রামে পৌঁছলে তো তোর গাড়ি দেখেই কত মানুষে শক-এই মরে যাবে তাই বা কে জানে! সইবে না। আমাকে ওরা আপন ভাবে।

মোটরাইজড-সাইকেলে চাপিস কেন ?

ন্যাকা বলল।

যাই বলিস, আমার ফটফটিয়া সাইকেলের ফটফট আওয়াজ নিজের কানে না গেলে যেন মাথাই খোলে না। ওই সিটে না বসলে কোনও রোগীর জন্যে কী প্রেসক্রিপশান লিখব, তাই মাথাতে আসে না।

এ যে দেখছি, তোর "দ্যা জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রমাদিত্য" রে!

ন্যাকা বলল।

ন্যাকার কথাতে সকলেই হেসে উঠল।

ঝাবু বলল, যাবি যাবি। আমরা সকলেই যাব। এখন কে কি খাবি বল ? চল, অন্য ঘরে যাই—যেখানে সেলার আছে। বার-বয় বেয়ারা আছে আবদুল।

আমি বললাম, এখানেই তো আমরা বেশ থেবড়ে বসে পড়েছি। মেয়েরা সোফাতে, আমরাও কেউ-কেউ। অন্যেরা মাটিতে, কার্পেটের উপরে। এখানেই যা খাবি, তা খা-না। আবার এ-ঘর ও-ঘর করবি ?

মেনকা বলল, তা ছাড়া মদ খেতে হলেই বারের স্টুলের টঙে চড়তে হবেই এ আবার আপনাদের কোন ঢঙ ?

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল, সব কিছুরই একটা ডেকোরাম থাকা উচিত। সায়েবরা অন্তত তাই মানে।

বললাম, খাবি তো মদ। তার আবার ডেকোরামের কী ? আমাদের পাড়ার পেঁচোদা, সেই যে রে, কবি পেঁচো, দল-বল নিয়ে খালাসীটোলায় মদ খেতে যেত যখন, তখনও কি ডেকোরাম মানতো ? কিংবা ছোটো ব্রিস্টলে ?

গুটলু বলল, পেঁচোদার নামে এখন কিছু বলিস না খবরদার। সে এখন মস্ত লোক। নতুন-বার্তা কাগজের দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা। ইচ্ছে করলেই তোমার আমার মুণ্ডুও চোখের ইশারাতেও নামিয়ে দিতে পারে।

কবি আর নেই এখন ?

অবশ্যই আছে। জোরটা তো কবি বলেই।

গুণ্ডামি-ভণ্ডামি করেও কি কবিতা লেখা যায় ?

মেনকা বলল, নতুন-বার্তার পাতা তো ওঁর লেখাতেই ফবটি পার্সেন্ট ভর্তি থাকে। পাতা-ভরানোর কন্ট্রাকটার।

আমি হেসে ফেললাম মেনকার কথাতে।

ঝাবু দু' কাঁধ শ্রাগ করে বলল, অ্যাজ ড্যু লাইক। তবে ও-ঘবটা একবার দেখলে পারতিস। ভাল লাগত তোদের। দেওয়ালে একটা মস্ত অয়েল পেইন্টিং আছে। শ্বশুরমশাই যত্ন কবে সাজিয়েছেন গুছিয়েছেন। এত সব গণ্যমান্য এলি তোরা—"বার"টা ব্যবহার করলে উনি খুশি হতেন।

উনি কোথায়।

ন্যাকা জিজ্ঞেস করল।

উনি তো এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে। আমি এখানে এলে ওঁকে ওখানে যেতে হয়।

তাই ?

হ্যাঁ রে।

অয়েল পেইন্টিংটা আছে বললি দেওয়ালে, কার আঁকা ? ফ্রেসকো না অয়েল পেইন্টিং ?

গুটলু বলল।

আরে না রে, ফ্রেসকো নয়, অয়েল পেইন্টিং। বেঙ্গল ক্লাবে যেমন আছে না। "Reynold's Room"—লাঞ্চের পরে মেম্বারেরা যে ঘরে বসে কফির সঙ্গে পাইপ অথবা সিগার অথবা সিগারেট খান।

আছে বুঝি ?

বোকার মতো আমি বললাম।

ওহ ইয়েস।

ঝাবু বলল।

তা দেওয়ালে অয়েল পেইন্টিংটা কার ?

সাকির।

কে সাকি ? কোনও দিশি আর্টিস্ট ?

আরে দূর। আর্টিস্ট নয় রে। সাকির ছবি। সাকি জানিস না ? ওমর খৈয়াম পড়িসনি ?

কান্তি ঘোষের ?

আঃ। সে তো অনুবাদ।

তুই কি অরিজিনাল পড়েছিস নাকি ?

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল, আরবিতে না ফার্সিতে ? না উর্দুতে ?

আমি কেরানি পাঁচু এইসব উচ্চমার্গের কথোকথনে ফ্রিজের মধ্যে জমে-যাওয়া ঘরে-পাতা দইয়ের মতো হয়ে গেলাম।

একটু পরেই ঝাবুর শ্বশুরমশাইয়ের সাকির ছবিঅলা বার অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্যে পুরুষেরা প্রায় সবাইই এবং মেয়েদের মধ্যে মেনকা এবং ঝিনি চলে গেলেন। তিন বন্ধুর স্ত্রীদের সঙ্গে আমি একা এ-ঘরে রয়ে গেলাম।

গুটলু চটে ছিল, ঝাবু ওকে ওমার খৈয়ামও পড়িসনি বলাতে। ওঘরে যেতে যেতে গুটলু বলল, তুই তো পড়ে উল্টে দিয়েছিস। নামটা জানিস এই পর্যন্ত।

ঝাবু বলল কাঁধ শ্রাগ করে, কী আর বলব তোকে ! তুই যা ছিলি স্কুলে তাই-ই রয়ে গেলি সারাটা জীবন।

কী রয়ে গেলাম ?

ফ্রগ ইন দ্য ওয়েল।

ঝাবু বলল, সকলকে নিয়ে ওঘরে যেতে যেতে।

ঘর ছেড়ে যাবার সময়ে হাসি একবার অপাঙ্গে তাকালো আমার দিকে। ভারি ভাল লাগল। যেন। সেই হাসিই।

বন্ধুপত্নীরাও সকলেই উঠে গেলেন সুন্দর বাড়িটা আর লনটা ঘুরে দেখতে। লন-এর এক কোণে অনেক পাখি ছিল। বড় বড় বহুরঙা পাখি। চিড়িয়াখানাতে দেখেছি। মল্লিকবাড়িতেও। ম্যাকাও না খ্যাঁকাও, কী যেন নাম পাখিগুলোর। সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার পাখি।

ওঘর থেকে যার যার গেলাস হাতে করে ওরা বসার ঘরেই এসে বসল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে। আমি ততক্ষণে বইয়ের আলমারিটা দেখছিলাম। স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির নানা সেট। তবে বইয়ের চেহারা দেখে মনে হল না কেউ কখনও একটিও বই পড়েছেন বলে। যেমন দেখাবার জন্যে থাকে বড়লোকের বাড়িতে, তেমনই আর কী!

একটা সেট দেখে খুব লোভ হল আমার, "লাইব্রেরি অফ ওয়ালর্ডস গ্রেট থিংকারস"। কিন্তু দেখলাম কাচের আলমারির গায়ে স্টিকার লাগানো আছে : "I do not lend books to any one. Sorry."

গদাইকে দেখে মনে হল ইতিমধ্যেই নেশা বেশ চড়েছে। চোখ দুটো লাল।

দেখি, গুটলু একটি বড় মাগ-এ করে হলুদ-রঙা বুড়বুড়ি-ওঠা বিয়ার নিয়ে এসে ঢুকল। আমাকে বলল, ধর ধর, তোর জন্যেই আনলাম।

আমি তো বললামই যে খাই না।

খাস না আবার কী! আমরাও কি সব মোদো-মাতাল নাকি? আজ একটা বিশেষ দিন! ন্যাংটা-পোঁদের বন্ধুরা সব জমায়েত হয়েছি, একটু আনন্দ করতে দোষ কী!

ল্যাঙ্গোয়েজ! ল্যাঙ্গোয়েজ।

ঝাবু বলে উঠল।

মহিলারা আছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলল।

গুটলু অনেকখানি জিভ বের করে, জিভ কাটল।

বলল, খেয়াল ছিল না।

তারপরই বলল, নে! ধর। আমার জিনটা নিয়ে আসি। পড়ে রইল ওঘরে।

মেয়েরা প্রায় ওদের সঙ্গেই ফিরে এল। মন্দিরা আর ঝিনি শ্যান্ডি খাচ্ছিল। বিয়ারের সঙ্গে লেমোনেড মিশিয়ে খাওয়াকে শ্যান্ডি খাওয়া বলে। শেখা হল। হাসি আর মেনকা দেখলাম নেয়নি কিছু।

হাসি পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলল, মদ না খেলে বুঝি আপনাদের আনন্দ হয় না।

হবে না কেন। হয়। তবে খেলে একটু বেশি হয়, এই আর কী।

ঝিনি বলল।

সবুজের জন্যে বিয়ার এনেছিল ন্যাকা। ন্যাকার হাতের গেলাসে দেখলাম, হালকা হলদেটে কোনও পানীয়। সোডার সঙ্গে নিয়েছে। বুড়বুড়ি উঠছে গেলাসে।

কী খাচ্ছিস তুই?

জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হুইস্কি।

দিনের বেলা আমি হুইস্কি খাই না। স্কচ, আফটার সান-ডাউন। সায়েবরা শিখিয়ে গেছিল না! সব জিনিসেরই নিয়ম-কানুন আছে।

ঝাবু বলল।

আরে, তোরা রোজ স্কচ খাস তাই। আমরা কি এ সব চোখে দেখতে পাই? তোর কল্যাণে যখন পেলাম, তখন খেয়েই নিই একটু। দিন আর রাত কী। একে মায় রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে, যেন স্মৃতিমন্থন করে বলল, শেষ খেয়েছিলাম আমার বউভাতের রাতে।

কী?

হুইস্কি আবার কী! মানে, স্কচ হুইস্কি।

সে কী রে! বউভাতের রাতে মদ খেয়েছিলি! মানে, ফুলশয্যের রাতে?

আরে সে এক গল্প! সব মিটেটিটে গেলে আমার বড় ভায়রাভাই, তিনিও তোরই মতো একজন ব্যবসায়ী। এন.আর.আই। বললেন, চলো ব্রাদার, তোমার জন্যে গাড়িতে আমি বন্দোবস্ত রেখেছি।

গাড়িতে?

ইয়েস। সব আছে। আইস-বক্স, গেলাস, জল, জনি-ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল। তোমাদের বাড়ি, শুনেছি খুবই কনসারভেটিভ।

তুই কী বললি?

গুটলু বলল।

বললাম, কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, যাদের কনসার্ভ করার

মতো কিছু থাকে তাঁরাই কনসার্ভেটিভ হন।

বউভাতের রাতে? আপনার শালী মুখে গন্ধ পেয়ে কান্নাকাটি করবে না তো? তা ছাড়া সে আমার ছাত্রী, আমি তার অধ্যাপক।

তারপর?

ভায়রাভাই বললেন, কথায়ই আছে, শাদীর প্রথম রাতে মারিবে বেড়াল।

সে প্রবচন, অচেনা, অদেখা, সম্বন্ধ করে যেসব বিয়ে তাদের বেলাই প্রযোজ্য।

আমি বললাম।

না ব্রাদার, না। হুইস্কির গন্ধমাখা ঠোঁটে জামাইবাবুকে অনেক চুমুই খেয়েছে আমার এই শালী। তার অব্যেস আছে। তবে সে সব চুমুতে কোনও কাম-গন্ধ ছিল না।

বললেন আমার ভায়রাভাই।

ন্যাকার স্ত্রী মেনকা রেগে উঠে বলল, এ সব বাজে রসিকতা আমার ভাল লাগে না। যদি সত্যি হত, তবেও না-হয় কথা ছিল।

সত্যি দিয়ে কবে আর রসিকতা করা হয়েছে বলুন মিসেস সেন!

গদাই বলল।

মেনকা রেগে বলল, ওর এই স্বভাব। স্ত্রীকে হেনস্থা না করলে, রসিকতাই হয় না। আমার শ্বশুরবাড়ির ট্রাডিশানই এই। এদের সব ভায়েরই। এদিকে উচ্চশিক্ষিত পরিবার।

গদাই বলল, তোদের দেশ কোথায় ছেল রে ন্যাকা? ববিশাল?

কেন?

না, শুনেছি। বরিশালের মানুষেরা নাকি স্ত্রী-নিগ্রহ করেন। বরিশাল থেকে মেয়ে আনতে হয়, দিতে নেই নাকি!

ন্যাকা বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, আমি বাঙাল বটে। তবে বরিশালের বাঙাল নই। আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশ ছিল ঢাকাতে। বেস্ট অফ দ্যা বাঙালস কাম ফ্রম ঢাকা।

আর ওয়ারস্ট?

গদাই জিজ্ঞেস করল।

দেশ নিয়ে ঠাট্টা করাতে অন্য যে-কোনও বরিশালীয়ার মতো চটে উঠে ন্যাকা চটাস করে চড় মারার মতো বলল গদাইকে, তোর আর সুশান্তর দেশ যেখানে ছিল। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম। শুঁটকি মাছ-খাওয়া বাঙাল।

অবজেকশান। অবজেকশান!

বলল, সুশান্ত।

তারপরই বলল, আমাদের বাড়ি কুমিল্লা। নোয়াখালি নয়। শুঁটকি মাছ আমরাও খাই। খবর্দার, শুঁটকি মাছ তুলে কথা বলবে না। পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্যা বেস্ট ডেলিকেসিস হচ্ছে শুঁটকি মাছ।

অনেকে হেসে উঠল সুশান্তর কথা শুনে।

গুটলু বলল, এতগুলো বাঙাল ছিল ক্লাসে তখন তো মোট্টে বুঝিনি। হাউ ডেঞ্জারাস।

বলেই, হেসে উঠল।

আমি বললাম, হাসার কিছু হয়নি। আমিও শুঁটকি মাছের ভক্ত। বম্বে ডাক, লইট্টা, চিংড়ি, শুঁটকি—রান্না করাটা একটা আর্ট। পেঁয়াজ, রসুন, শুকনো লংকা দিয়ে কষে রাঁধতে পারলে এক থালা ভাত খাওয়া যায়। তবে বাঙালত্ব এখন আর কার আছে বল? এখন তো পূর্বপুরুষেরাও সেই দেশের ভাষা ভুলে গেছেন, খাওয়া ভুলে গেছেন। দেশ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসবও গেছে।

এই আরম্ভ হল খাওয়া-দাওয়ার কথা।

হাসি বলল।

তারপর বলল, পূর্ববঙ্গের মানুষদের কাছে খাওয়ার চেয়ে বড় জিনিস আর নেই।

ইয়েস।

সুশান্ত বলল, উই অল বিলিভ দ্যাট দি ওনলি ওয়ে টু দ্যা হার্ট ইজ থ্রু দ্যা স্টম্যাক।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে আমি বললাম গদাইকে, গদাই তোর স্ত্রীকে কিন্তু আমি চিনি।

মানে? আমিই ভাল করে চিনি না, আর তুই চিনিস মানে?

মানে, বিয়ের আগে চিনতাম আর কী!

হাসি খরগোসের মতো কান-খাড়া করে আমার কথা শুনছিল। এখন অবাক হওয়ার ভান করে বলল, তাই বুঝি! আমি তো...

আমি একটু অপমানিতই বোধ করলাম। মেয়েদের সম্বন্ধে আমি কমই জানি। খুবই কম। অধিকাংশ মেয়েই যে জন্ম-অভিনেত্রী সেকথা আমি জানতাম না। কিন্তু হাসিকে আমি বিলক্ষণই চিনতাম অথচ সে আমাকে চেনে না ভান করাতে অতজনের সামনে লজ্জাতে পড়লাম।

আমি বললাম, আপনাদের কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়ার বাড়ির পাশের লাল-রঙা বাড়িটা আমার মামাবাড়ি। রানী মামিমা, পুষি

মামিমারাতো আপনাদের বাড়ির লোকই ছিলেন বলতে গেলে। আপনার খুড়তুতো দাদা বিজু...

হাসি, একটা মিশ্র অভিব্যক্তির হাই-তোলার মতো শব্দ করে বলল, মানে ? আপনি কি অবুদা ?

আমি মাথা নোয়ালাম।

হাসি এবারে বলল, এতজন বুড়োর মধ্যে আপনাকেই একমাত্র যুবক দেখে ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন ভাল করে লক্ষ করে দেখছি মুখের আদল অবশ্য একই আছে কিন্তু আপনার বয়স তো থেমে রয়েছে একই জায়গাতে। বন্ধুদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এগোয়নি। তা ছাড়া, আপনাকে তো আমরা অবুদা বলেই জানি, পচা নামটা তো জানা ছিল না। তাই চেনা লাগলেও...

ঝাবু বলল, আহা! হোয়াট আ কমপ্লিমেন্ট। পচা, কনগ্রাচুলেশানস। ও চিরদিনেরই পচা। অর্ণব ও হতেই পারে না। সমুদ্র কি কখনও পচতে পারে!

পচা আর গুটলু ব্যাচেলর। তাই ওরা অনেক ইয়াং আছে। পচা যদি ইয়াংই থাকে তো তোমারই লাভ!

অশেষ ওরফে গদাই বলল, তার স্ত্রী হাসিকে।

হাসি ওর হাঁসীর মতো গ্রীবা ঘুরিয়ে ভুরু তুলল গদাই-এর দিকে।

আশ্চর্য হলাম দেখে যে, হাসি যেন ঠিক তেমনই তরুণী আছে। যেন ওদের বাগানের মস্ত কনকচাঁপা গাছটার নিচে যে কয়েকটি বড়গাছের কাটা গুঁড়ির অবশিষ্টাংশের উপরে বসে আমাদের গান-গল্প-সাহিত্যালোচনা চলত সেই আলোছায়াময় দু' যুগ আগের একটি দুপুর থেকে যেন আজ সোজা উঠে এসেছে সল্ট লেক-এ ঝাবুর এই শ্বশুরবাড়িতে। এতগুলো বছর যেন ফিরে এসেছে দ্রুত বেগে, ব্যাক-গিয়ারে।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম।

হাসি গদাইকে জিজ্ঞেস করল, লাভ মানে ?

গদাই বলল, লাভ মানে, লাভ। একজনের লাভ মানে আর একজনের ক্ষতি অবশ্যই বোঝায় সচরাচর। তোমার লাভটা নিট লাভ। পচারও। ক্ষতিটা আমার।

গদাইয়ের কথার এই হেঁয়ালিতে সকলেই একটু অবাক এবং আপসেট হল। হাসি একটু বেশি এবং সামান্য বিব্রতও।

আমি বললাম, হাসিকেই বাঁচাতে ; তোর স্ত্রীকে কিন্তু আমার খুবই পছন্দ ছিল গদাই। আমার মামাবাড়ির সকলেরও খুব পছন্দ ছিল।

ওকে। ওর খুড়তুতো দাদা বিজু, মানে তোর সম্বন্ধী আমার খুব বন্ধু ছিল। বহু বিষয়েই মনের মিল ছিল আমাদের। একটা সময় ছিল, যখন প্রতি বছর গরমের ও পুজোর ছুটির পুরোটাই আমি মামাবাড়িতেই কাটাতাম। তোর শ্বশুরবাড়িতে এবং আমার মামারবাড়িতেও গান-বাজনার খুব রেওয়াজ ছিল, প্রকৃত শিক্ষিত পরিবার তোর শ্বশুরবাড়ি...

আমার শ্বশুরবাড়িকে কি আমার চেয়ে তুই বেশি চিনিস নাকি ?

অত লোকের সামনে বিব্রত হয়ে আমি বললাম, আমি কী তাই বলেছি !

তা হলে হাসিকে তুইই বিয়েটা করে আমাকে বাঁচালি না কেন শালা !

আমার মাথাতে হঠাৎই রক্ত চড়ে গেল। অপমানটা গদাই আমাকে করেনি, হাসিকেই করেছিল, তাই।

আসলে কথাটা যে গদাই রসিকতা করেই বলেছিল তা না বুঝে রেগে উঠে আমি বললাম, আমি তো চেয়েইছিলাম। সম্ভবত হাসিরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমি যে গরিব ছিলাম রে গদাই ! তোর মতো বড়লোক ব্যবসাদার তো ছিলাম না।

গদাই সিরিয়াসলি এবং রাগের গলাতে বলল, জানি না। এদিকে বলছিস, প্রকৃত শিক্ষিত পরিবার, গান-বাজনা-সাহিত্য এ সব নিয়েই যাঁদের ওঠা-বসা, তাঁরাই তোর মতো প্রকৃত শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে আমার মতো প্রকৃত অশিক্ষিতর হাতে মেয়ে তুলে দিলেন কী করে !

হাসি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসছি।

বলেই, ঘর ছেড়ে লন-এর দিকে চলে গেল।

সকলে মিলে গদাইকে আক্রমণ করল এবারে বন্ধুরা।

বলল, তুই যেমন রাসকেল ছিলি একটা, তেমনই আছিস। এমন করে কেউ অপমান করে কারও স্ত্রীকে এতজন সদ্য পরিচিত মানুষের সামনে !

আমি বিয়ারটা এক চুমুকে শেষ করে, গলাটা খাঁকড়ে নিয়ে বলতে গেলাম কিছু, কিন্তু ইতিমধ্যেই গদাই বলল, যার জন্যে এই হরকৎ তা সার্থক।

তারপরে গদাই গর্বিত গলায় বলল, দ্যাখ, দ্যাখরে সবাই, পচা বিয়ারের মাগ সাফ করে দিল কীরকম, উত্তেজিত হয়ে। আই হ্যাভ মেড হিম আ কনভার্ট।

কেউ কেউ হেসে উঠল। কিন্তু সবাই নয়।

গুটলু আমার মাগটা তুলে নিয়ে চলে গেল আবার ভরে আনতে।

ভাবলাম, ইউ টু ব্রুটাস!

আমি আগে কোনওদিনও এ সব খাইনি। মনে হল, ওই জিনিসটা মাথায় যাওয়াতে একটু সাহস পাচ্ছি যেন। চিরদিনের কেরানি, চিরদিনের মধ্যবিত্ত অর্ণবের মধ্যে যেন সত্যি সত্যিই কোনও অর্ণব ছিল, যাকে আজন্ম উপলব্ধি করিনি, সে যেন আজ আমার অন্তর্জগতে তুমুল কলরোল তুলে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর সফেন উচ্ছ্বাসে আমার আমিত্বর মধ্যে সমুদ্রের অতলে ঘুমন্ত কোনও আগ্নেয়গিরির মতো হঠাৎই ঘুম ভেঙে উৎক্ষিপ্ত রক্তবর্ণ লাভার স্রোতে সব শৈত্যকে ছিঁড়ে ফেলে আলোড়ন তুলল। কিন্তু এও মনে হল যে, এই আলোড়ন প্রলয়ংকরীও হয়ে উঠতে পারে।

গদাই, নিজের গেলাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে ওর পানীয় শেষ করে, যেন বিদ্রূপের সঙ্গেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, তুই যেন কিছু বলবি বলবি মনে হচ্ছে আমাকে, কি বে পচা?

ন্যাকা বলল, গদাই, এভরিথিং হ্যাজ আ লিমিট।

আমি গদাইকে বললাম, হয়তো বলব। তবে আজ নয়, এখানে নয়। বেচারি গুটলুর এত কষ্ট, এত কল্পনা সব নষ্ট হয়ে যাবে যদি এখানে তোকে বলি, যা বলতে চাই।

গদাই সাহেবদের মতো ইংরেজি উচ্চারণ করে গলা তুলে, আঙুল তুলে বলল, লিসসিন! লিসসিন! জাস্ট ওয়েট আ মিনিট।

তারপরই ন্যাকার দিকে ঘুরে বলল, আর তুই চুপ করতো ন্যাকা, মাঝে পড়িসনি। পচাকে বলতে দে। পচা বলুক, যা বলার আছে ওর।

আমিই বললাম, নাকি আমার ভেতর থেকে অন্য কেউ বলল, জানি না, এমনভাবে জীবনে আমি কখনওই কথা বলিনি কারও সঙ্গে। বললাম, দেখ গদাই! তুই খুব বড়লোক হয়েছিস আমি জানি।

গদাই হঠাৎ ভীষণই চটে উঠে বলল, সি.পি.এম.-এর ক্যাডারদের মতো তোতাপাখির বাঁধা বুলি কপচাসনি তো! বড়লোক হয়েছি আজ নয়, হাসিকে বিয়ে যখন করি, তখনই আমি বড়লোক ছিলাম। আর বড়লোক হয়েছিলাম বলেই তো নেদেরপাড়ার সেই পরিবার তাঁদের সুন্দরী, গুণবতী, বিদুষী মেয়েকে তোর মতো কেরানির সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে আমার মতো বড়লোকের সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে

আমার দোষটা ছিল কোথায় ? তা ছাড়া আমি তো বাবার জোরে বড়লোক নই রে পচা। আমিও গরিবই ছিলাম। নিজের চেষ্টাতে বড়লোক হয়েছি। কেউ আমাকে কিছু পাইয়ে দেয়নি। বাবা কী শ্বশুর, কী মিনিস্টার! তাতে লজ্জার তো কিছু নেই। বড়লোক হওয়ার মধ্যে লজ্জা নেই, বড়লোকী দেখানোর মধ্যে আছে। এই শালার হা-ভাতেদের দেশে গায়ের ঝাল মেটাবার কিছুমাত্র যখন না থাকে হাতের কাছে, তখনই "বড়লোক" বলে গালাগাল দেয় লোকে। অথচ সব শালাই নিজের নিজের মনের কোণে বড়লোক হবার সাধটি এমন করে লালন-পালন করে, তাকে এমন আদরে-যতনে রাখে যে, নিজের দু-উরুর মাঝের খোকাটিকেও কোনও শালা পুরুষে এত ভালবাসে না।

আঃ। কী হচ্ছে!

ঝাবু বলল।

ইতিমধ্যে গুটলু এল এক হাতে আমার জন্যে পূর্ণ বিয়ার মাগ আর অন্য হাতে তার নিজের গেলাস পূর্ণ করে নিয়ে।

আমার মনে পড়ে গেল, বাবা বলতেন, মদ জিনিসটা ভারি খারাপ। আর এই খারাপত্বটা হচ্ছে সাপের মতো। এমনিতে দেখা যায় না। যখন দেখা দেয়, তখন লুকিয়ে থাকা সাপের মতো মরণ-ছোবল মারে। কিছুই করার থাকে না।

গুটলু বলল, এটা কি রিইউনিয়ন ? ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! তুই দেখালি বটে গদাই।

গদাই বলল, ইয়েস। ভেরি-মাচ রিইউনিয়ন। ন্যাংটো-পোঁদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই কি ফুল-ছোঁড়াছুঁড়ি করতে হবে। শাল্লা! আমরা কি সোনাগাছির সাঁটুলি! রকে বসে যখন আড্ডা মারতাম ছেলেবেলাতে তখন কি শুধু প্রেমের কথাই হত, সিনেমার কথা, খেলার কথা, ঝগড়া হত না ? কত তুচ্ছ কারণেই ঝগড়া হত। সেদিনের ম্যাচে মোহনবাগানের রাইট-উইংগারের পেনাল্টি কিকটা গোলপোস্টের এক আঙুল উপর দিয়ে গলিয়ে দিয়েচে বলে গুটলুর সঙ্গে আমাদের হাতাহাতি, লাথালাথি হত না কি ? আজ আমাদের বয়স হয়েছে, আমরা কেউ-কেটা হয়েছি বলেই কি আমাদের চরিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে ? হয়তো কিছুটা গেছে। কিন্তু আজকে আমরা সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে যাওয়ার জন্যেই এখানে জমায়েত হয়েছি। ঝগড়া হলেই কি মেনে নিতে হবে যে, ভালবাসা নেই ?

সুশান্ত গদাইকে সমর্থন করে বলল, আর বদলেই যদি সকলে

গেছে তো এই রিইউনিয়ন কিসের জন্যে ? কেন ? পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই তো রিইউনিয়ন ? এটা কি যাত্রার আসর ! থ্যাটার করতে এসেছি এখানে আমরা !

বলেই বলল, কী রে ঝাবু। তুই কী রে ! নিজে হোস্ট হয়ে আমার গেলাসের দিকে তো কোনও খেয়ালই নেই ! আর ডি-ফ্যাক্টো হোস্ট গুটলু তো একমাত্র পচাকেই দেখে যাচ্ছে। তার চেয়ে একটা বেয়ারাকে বল না এ-ঘরে চোখ রাখবে আমাদের গেলাসের উপরে। দরজাতে ডিউটি দিয়ে দে।

যা বাক্যির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গদাই, বেয়ারারা তা শুনলে কি আমাদের মান বাড়বে ?

যাদের সত্যিকারের মান আছে, তাদের মান এত সহজে যায় না।

ন্যাকা বলল, ঝগড়াটা তো মোহনবাগানের গোল নিয়ে নয়। এটা একটা অন্য ব্যাপার। অত্যন্ত সেনসিটিভ ব্যাপার।

আমি বললাম, হাসিদের পরিবারকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি। হাসিকেও চিনতাম। গদাই, তুই বড়লোক, তুই সাকসেসফুল, বড়লোক যে হয়েছিস সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টাতেই এ সব কেউই অস্বীকার করবে না। তা বলে, তোর স্ত্রীকে তুই এতজনের সামনে এমন করে বলবি ! আর কেন বলবি ? না অপরাধের মধ্যে সে আমাকে চিনত ! এটা কি কোনও অপরাধ ?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল গদাই যাত্রাদলের রাজার মতো।

বলল, তুই কি ভাবছিস তোর প্রতি জেলাস হয়েছি আমি ? আমার এই বিয়েটাই একটা মস্ত ভুল। নিয়ে নে না তুই তোর হাসিকে। এখুনি নিয়ে নে। বেঁচে যাই আমি। শি ইজ আ বার্ডেন ইন মাই লাইফ। আমার মেয়ের অভাব কী ?

এই কথাতে মেনকাও ঘর থেকে উঠে চলে গেলে বাইরে। হয়তো হাসিরই কাছে। অথবা হাসিদের কাছে।

গুটলু বলল, যা হোক একটা কেলোর মতো কেলো করলি তুই গদাই ! কোনও মানে হয় ! কেন যে ছাই মরতে রিইউনিয়নের আইডিয়াটা এসেছিল আমার মাথাতে।

॥ ৮ ॥

আজ উঠেছিলাম খুবই ভোরে। তখনও অন্ধকার ছিল। হাসি বলেছিল, শান্তিনিকেতনে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসেই যাবে। ভোর

ছ'টাতে ছাড়ে।

হাওড়া স্টেশনের মেইন প্লাটফর্মের বড় ঘড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল আমার ঠিক ছ'টা বাজতে দশ-এ। কিন্তু ভোর পাঁচটাতে ফোন করেছিল হাসি এ কথা জানাতে যে, ন'টা দশ-এ এলেই চলবে। ওর অসুবিধা হয়ে গেছে ভোরের গাড়িতে যেতে। কাঞ্চনজঙ্ঘার বদলে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে যাবে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ফোনটা ধরেছিল ছোটবউদিই।

কাল একাদশী গেছে, নবনীর শ্বশুরমশায় বোধহয় চলেই গেলেন। ভাল খবর দিতে এই সময় আর কে ফোন করবে!

এই কথা বিড়বিড় করে বলতে বলতে ছোটবউদি ফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

ছোড়দার ঘরের সামনেই খাওয়ার বারান্দাতে থাকে ফোনটা। আমি ততক্ষণে উঠে পড়ে চান-টান করে তৈরি। ছোট ব্যাগটার মধ্যে বাথরুম স্লিপারটা ঢোকাচ্ছি এমন সময়ে ফোনটা আসাতে নিজে আর ধরতে পারিনি।

ছোটবউদি ফোন নামিয়ে রেখে এসে বলল, এই যে! তাড়া করার দরকার নেই কোনও। ধীরে-সুস্থে সেজে-গুজে গেলেই চলবে। জলখাবারও খেয়ে যাবেন। লুচি আলুর তরকারি করে দেব নাকি?

ছোটবউদি সম্পর্কে বড় হলেও বয়সে আদৌ বড় নয়। তাই ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক। ঠাট্টা ইয়ার্কি করতামও সবসময়েই। যখন বিয়ে হয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ি তখন সবে একুশে পা দিয়েছে। তবুও কেন জানি না, আমরা দু'জনেই দু'জনকে আপনি করে বলতাম। আমি বলতাম, 'ছোটবউদি' কিন্তু সে কখনও আমার ভাল বা খারাপ কোনও নামেই ডাকত না। বিয়ের পরে পরেই বলেছিল, যা তা! ঘরের মধ্যে আপনার একটা নামেও আপনাকে ডাকা যায় না।

কেন?

জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

এই যে, সমুদ্র কি আঁটে? ঘরে? নাম কি, না অর্ণব! আর পচা জিনিসও কি কেউ ঘরে রাখে? তাই "এই যে" বলেই ডাকত আমাকে। ডেকে এসেছে এতগুলো বছর। আর ছোড়দাকে বলত "ওগো"। শরীরের বাঁধন এত বছরেও একটুও ঢিলে হয়নি। জানি না, দোর-বন্ধ করে যোগ ব্যায়াম-টায়াম করে কিনা! ছেলেমেয়ে নেই

বলে একটা চাপা কষ্ট আছে। বড়দার ছোট ছেলে পল্টুকে সন্তানজ্ঞানে দেখে।

ছোটবউদির মুখ-না-ধোওয়া চোখেও দুষ্টুমির ঝিলিক দেখলাম। বলল, রিইউনিয়ন করে গুটলুবাবুর কি লাভ হল তা জানি না, তবে লাভ একজনের যে অবশ্যই হয়েছে, সন্দেহ নেই।

বললাম, ইয়ার্কি মারবেন না।

দেওরের সঙ্গে বউদি ইয়ার্কি মারবে না তো কে মারবে? চা করবো? না ঘুমিয়ে নেবেন আর একটু? এখন কত রাত বিনিদ্র কাটবে কে বলতে পারে!

বাব্বা! আজ এত খাতির!

কথা ঘুরিয়ে বললাম আমি।

এতদিন হয়তো দাম বুঝতে পারিনি লক্ষ্মণ দেওরের! একটা মাত্র দেওর বলে কথা। অন্যে দাম দেওয়াতেই দামটা স্পষ্ট হল।

তারপর বলল, এই যে, আমিও কিন্তু কোনওদিনও শান্তিনিকেতনে যাইনি। নিয়ে যাবেন আমাকে একবার।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, হাসি টাসি নয় কিন্তু। শুধু আমি আর আপনি।

কপট রাগ ঝরিয়ে বললাম, সাহস তো কম নয়।

আপনাকে নিয়ে একদিন বটানিক্যাল গার্ডেন-এ যাব। সারাদিন থাকব। পিকনিক করব। আর কাউকেই নেব না সঙ্গে, এমনকি পল্টুকেও।

তাই? মিথ্যে কথা বলবেন না। সকলেই কি হাসি নাকি?

ছোড়দা রাগ করবে না?

হিঃ। ভালই বলেছেন! সে মানুষটার রাগ দুঃখ আনন্দ ভালবাসা সে সব কোনও অনুভূতিই নেই। কতরকমের মানুষই যে সৃষ্টি করেছিলেন বিধাতা একই পরিবারে। অনুজের নাম যদি "পচা" হয়, তার নাম হওয়া উচিত ছিল "গলা"।

আমি হাসলাম। বললাম, বেচারা ছোড়দা। সাতসকালে। সাতে নেই, পাঁচে নেই।

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। মাটির ঢেলার সঙ্গেই জীবন কাটালাম। এমন আনইন্টারেস্টিং মানুষ আর দেখিনি। এর চেয়ে আমার বর যদি আমাকে মারধোরও করত তা হলেও জানতাম যে অন্তত একজন জীবন্ত মানুষের সঙ্গে ঘর করছি। যা তা। আমার জীবনটা, জীবনময়ই যা তা!

তারপর বলল, আমাদের "এই যে" কে অন্যে দাম দেওয়াতেই আমাদের কাছেও আপনি দামী হয়ে উঠলেন হয়তো। এই কারণেই সকলেরই হয়তো নিজের নিজের জীবনের ঘেরাটোপের বাইরে মাঝে মাঝেই যাওয়া উচিত। কার জন্যে যে কী অপেক্ষা করে থাকে অথবা কে, তা কে বলতে পারে।

তাই?

বলেই, হেসেছিলাম আমি।

ছোটবউদি গ্যাস জ্বেলে চায়ের জল চাপাল আমাদের দুজনের জন্যে। আজ মুসলমানদের কোনও পরব আছে। তার ছুটি। এ বাড়ির ঘুম সাতটার আগে ভাঙবে না আজ। কাগজও আসবে দেরি করে। কাগজওয়ালারাও কি ছুটির দিনে দেরি করে ওঠে? কে জানে!

ভাবছিলাম, বাইরে তো কোথাওই যাই না, যাই না কতদিন, তাই শান্তিনিকেতনে যাব যে, তা নিয়েই আমার উত্তেজনার শেষ ছিল না। হাওড়া স্টেশনেও তো যাইনি প্রায় এক যুগ। বড়দার মেজশালা হেরম্ববাবু যখন মারা গেলেন তখন মিহিজাম থেকে বড়বউদির দিদি-জামাইবাবু এসেছিলেন। তাঁদেরই ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে গেছিলাম।

রেলগাড়ি দেখলেই আমার হাঁটু কাঁপে ভয়ে। এ-কথা কারওকে বলি না লজ্জায়। কিন্তু সত্যিই কাঁপে। মনে মনে কত দূরে, কত সব অদেখা দেশে যে চলে যাই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই সব গাড়িতে ভয়ে ভয়ে, মনে মনে চড়ে যে তা কী বলব। কিন্তু বড়ই ভয়ে ভয়েই যাই। ডেইলি-প্যাসেঞ্জারদের আমি খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। তাঁরা সবাই ক্ষণজন্মা মানুষ। সকালে বিকেলে রেলে চড়া! ভাবা যায় না।

॥ ৯ ॥

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হাসিই বলেছিল। বেশ ঘুমও পেয়েছিল। দরজা লক করে দিয়ে চমৎকার চওড়া খাটে, ম্যাট্রেসের গদিতে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নানা পাখির কিচিরমিচির শুনতে শুনতে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎই মনে হল, বহু দূর থেকে কে যেন ডাকছে আমায়। মা যেমন ডাকতেন, খেলতে খেলতে সন্ধে

হয়ে এলে, পচা, পচা করে।

অবুদা! অবুদা! বলে, কে যেন ডাকল আমাকে।

কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়ার মামারবাড়ির একতলার ঘরে শুয়েছিলাম। জানালার পাশে মস্ত খাট। পাশাপাশি ছ'জন মানুষে শুতে পারে। তিনটে জানালা ছিল ঘরটাতে। বাগানের দিকে। মস্তবড় কনকচাঁপা গাছটার ছায়াতে সবসময়েই ছায়াচ্ছন্ন থাকত বাগানের অনেকখানি। বকুল গাছ ছিল। শিউলি। বারোমেসে শিউলি। শুধু শরতেই নয়, সারাবছর কী ফুল যে ফুটত। ছোটমামা বলতেন "ফ্রিক অফ নেচার"। সারা সকাল দস্যিপনা করে জম্পেস করে পাঁচ পদ দিয়ে খেয়ে আরামে ঘুম লাগাতাম দুপুরে। সেই সময়ে গরীবস্য গরীব বাঙালিও আজকের তুলনাতে অনেকই বড়লোক ছিল। মামিমারা, মামারা, বড়ই যত্ন করতেন। খাওয়া-দাওয়া, নানারকম বই পড়া, মামাতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে খেলা, চু-কিত-কিত, ওয়ার্ড-মেকিং। সন্ধের পরে কখনও গোল হয়ে বসে অন্ত্যাক্ষরী। নানারকম গানও গাওয়া হতো।

হাসি তো অসাধারণ ভাল গাইত। ওর গলাতে শোনা অতুল সাদের একটি গান ; "বিফল সুখ আশে, জীবন কি যাবে" গানখানি সেদিন চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্তর গলাতে দুর্গাবাড়িতে শুনে বড় নস্টালজিক হয়ে পড়েছিলাম। অসাধারণ ভাল গায় মেয়েটা। সেই প্রথম যৌবনের হাসিরই মতো। তখন আমিও গান গাইতাম।

আশ্চর্য! এই পচাও গান গাইত। ভাবা যায়!

ওই ঘরেরই জানালার পাশে এসে দাঁড়াত হাসি দুপুর ফুরোলেই। গরাদ-দেওয়া জানালা। তখন সব জানালাতেই গরাদ থাকত বলেই বোধ হয় কোনও মানুষেরই মনের মধ্যে গরাদ থাকত না।

যখন ছোট ছিল তখন ফ্রক পরে আসত। সেই চেহারাটা ভুলে গেছি। বারো-তের বছর বয়স থেকেই শাড়ি পরত। সব সময়েই শান্তিপুরী ডুরে পরত। কখনও কখনও কটকী শাড়ি। জংলা কাজের। হাসির মামাবাড়ি ছিল কটকে। প্রতিবছরে ওর ছোটমামিমা দোলের সময়ে আসতেন যখন, তখন নিয়ে আসতেন কটক থেকে।

একবার পুজোর সময়ে কৃষ্ণনগরে ছিলাম। মনে আছে, এক অষ্টমীর রাতে মামাতো ভাই-বোনেরা আর হাসিরা, মানে, হাসি আর হাসির জ্যাঠতুতো দাদা আমারই সময়বয়সী বিজু, একসঙ্গে আরতি দেখতে গেছিলাম। গর্জন তেল-মাখা মা দুর্গার ঢলঢলে মুখখানি, বড় বড় চোখ, এখনও যেন চোখে ভাসে। ঢাকের বাদ্যি, কাঁসরের

ঝনঝন, ধুপ-ধুনোর আর অগণ্য নতুন শাড়ির মনমাতানো গন্ধ, বৃদ্ধ পুরোহিতের নিবেদিতপ্রাণ আরতি, আর আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা হাসি।

হাত ধরে রাখতে বলেছিল বিজুই, পাছে তার সালঙ্কারা বোন হারিয়ে যায় ভিড়ে। সেই রাতে একটা মসৃণ রেশমী শাড়ি পরেছিল হাসি। খুব সুন্দর করে সেজেছিল। সুগন্ধি মেখেছিল। হাতে, মায়ের বাজুবন্ধ, পায়ে পায়জোর, গলাতে সাতনরী হার। কালো জমি আর সিঁদুরে পাড় ছিল শাড়িটার। নাম বলেছিল হাসি, কাঞ্জিভরম সিল্ক। দক্ষিণ ভারতের শাড়ি নাকি! হবে। আগে ওই শাড়ি আমার পরিচিত কারওকেই পরতে দেখিনি। হাসির বড়লোক জ্যাঠতুতো মামা, যিনি দিল্লিতে থাকতেন, দিয়েছিলেন ওকে পুজোতে। তিনি হাসির মাকে খুব ভালবাসতেন।

আরতি দেখে আমরা ফিরে আসছিলাম। মাথার উপরে ছিল শরৎ-রাতের নীলাকাশের অষ্টমীর চাঁদোয়া। হিম পড়া শুরু হয়েছিল। ছিল শিউলি আর শরতের রাতের শিশিরের আর হাসির গায়ের গন্ধ। আমার দুই মামাতো বোনের গায়েও সুগন্ধ অবশ্যই ছিল তবে তা বিজুর নাকে যতটা স্পষ্ট লেগেছিল আমার নাকে হয়তো তেমন লাগেনি। সব নাক, সব গন্ধ—প্রত্যাশী হয় না, সব চোখ যেমন সব দৃশ্য-প্রত্যাশী হয় না। আলোছায়া-ভরা কাঁচা পথ দিয়ে আমরা মামাবাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম। পুজোমণ্ডপের আরতির সম্মিলিত ঢাক ও কাঁসির শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। হাসি আমার গায়ের কাছে ঘন হয়ে এসে গাঢ় গলাতে বলেছিল, শিউলির ভাল নাম কী, বলো তো অবুদা? আমার ভারি ভাল লাগে শিউলির গন্ধ। মনটা যেন কেমন কেমন করে।

ছেলেবেলা থেকেই গাছ-গাছালির প্রতি হাসির দারুণ আকর্ষণ ছিল। ওর বাবা প্রশান্তমামার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্টবেলা থেকে ও সাতসকালে উঠেই বাগানের কাজ করত। আমার বড়মামিমা তাই ওকে ডাকতেন মালিনী বলে। ওর মাকে বলতেন, চামেলি, যাদের বাড়ি মস্ত বাগান নেই, যারা বড়লোক নয়, যাদের রুচি ভাল নয়; তাদের বাড়িতে বিয়ে দিস না হাসিকে।

চামেলি মাসি বলতেন, আমার মেয়েকে কোন বড়লোকে বিয়ে করবে বল নলিনী দিদি! কী দিতে পারব জামাইকে?

কিছুই দিতে হবে না। তোর এমন মেয়েকে কত রাজপুত্তুরে তুলে নিয়ে যায় দেখিস। যারা জানে, তারা জানে যে, "পড়তি ঘর"

থেকেই মেয়ে আনতে হয়। "উঠাত ঘরে"র মানুষে এসে নিয়ে যাবে হাসিকে। উঠতি ঘরের কৌলিন্যই তাতে বাড়ে। টাকা থাকলেই হয় না, টাকা কী করে খরচ করতে হয় তাও জানা চাই।

ওই কথা শুনে আমার ভারি রাগ হত। কারণ, আমাদের যে না-উঠতি না-পড়তি ঘর। আমাদের এজমালি বাড়ি যেমন ছিল, তেমনই আছে। থাকবেও। আমাদের পরিবার যুগ যুগ ধরে Static। স্থিতাবস্থাতে আছে। নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু! অথচ আমারই সামনে কেউ এসে নিয়ে যাবে হাসিকে এই ভাবনাটাও আমার সহ্য হত না। উত্তর কলকাতার দমবন্ধ আবহাওয়া থেকে কৃষ্ণনগরের খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে এসে কী ভাল যে লাগত কী বলব। হাসির বিয়ে হয়ে যাবার পরে বুঝেছিলাম যে সেই প্রকৃতির মধ্যে হাসিও পড়ত। অবশ্যই পড়ত। আমার ভাললাগাব প্রকৃতির সিংহভাগই জুড়েছিল হাসি।

কিশোরী হাসি জানালা দিয়ে ডাকত, অবুদা, এই অবুদা।

ঘুম ভেঙে বলতাম, কী? ডাকছ কেন?

কী যে ঘুমোন পড়ে পড়ে! আসুন না কাঁচপোকা ধরব।

কাঁচপোকা?

হ্যাঁ। প্রজাপতিও।

কোনওদিন বলত, কাঠবিড়ালি বাচ্চা দিয়েছে, দেখবেন?

হুঁ।

কুঁচফল পাড়তে যাবেন? নদীপারে?

গাছকোমর করে শাড়ি পরত হাসি। পিঠময় কালো চুল ছড়ান। কী তেল মাখত জানি না। তবে আমার মা অথবা মামিদের চুলে ওই গন্ধ ছিল না। অন্যরকম গন্ধ বলেই ভাল লাগত বেশি। আকর্ষণ করত, ছোট হাতার ব্লাউজে, কিশোরী হাসি। আমার তখন সদ্য-যৌবন, কামাতুর পায়রার মতো ছটফট করতাম সবসময়ে অথচ ছটফটানির কারণটা জানতাম না। ওকে, ও ছোট বলে, মানুষের মধ্যেই গণ্য করতাম না, জানি না, ও-ও হয়তো করত না আমাকে। কিন্তু ভারি ভাল লাগত ওর সান্নিধ্য। হয়ত ওরও ভাল লাগত আমার সান্নিধ্য। নইলে ওদের পাড়াতে অত ছেলে থাকতে কলকাতা থেকে ন' মাসে ছ' মাসে-আসা অবুদার প্রতি ওর অত টান কেন ছিল!

খুব সুন্দর আগমনী গান গাইত হাসি। ওর মায়ের কাছে শেখা। দুটি গান তো এখনও আমার কানে লেগে আছে। একটা—"এসেছিস মা, থাক না মা তুই দিনকত"; আর

অন্যটা—"দেখো না নয়নে গিরি, গৌরী আমার সেজে এল।"

ভগবান নিজের গলাতে সুর দেননি কিন্তু গান-পাগল আমি। হাসিকে সে-কারণেও খুব ভাল লাগত। মানে, সুন্দর গান গাইত বলে।

অবুদা! অবুদা! ওঠো! আলো মরে এল। চলো, একটু হেঁটে আসি।

গভীর ঘোরের সুগন্ধি-স্বপ্ন থেকে ফিরে বাস্তবে এসে বুঝলাম যে, আমি কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়াতে নেই, শান্তিনিকেতনে আছি। এবং হাসিরই বাড়িতে। মন আমার ঘুম-ভাঙা বিড়ালীর মতো আড়মোড়া ভাঙল। এক গভীর সুখানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে গেলাম।

উঠে, দরজা খুলেই দেখি, এক দরজা হাসি। চান করেছে, শাড়ি বদলেছে। বেলডাঙার পাকা কুমড়োর রঙের একটি শাড়ি পরেছে, হলুদে আর লালে মেশানো। সঙ্গে একটি পেঁয়াজখসী-রঙা ব্লাউজ। ছোট হাতার। ছোটবউদিরা যাকে বলে মেগিয়া-স্লিভস। কাজল দিয়েছে চোখে। বেণী বেঁধেছে। তাতে একটি রক্তকরবী গোঁজা।

অনেকক্ষণ আমি কোনও কথাই বলতে পারলাম না হাসির দিকে চেয়ে।

ভাবছিলাম, এ সবই কি আমারই জন্যে? নাকি নিত্যদিনই ও এমনি করেই সাজে। পচাও কি এত ভাগ্যবান! জীবনের শেষ বিকেলে পৌঁছে এই নরম নিভৃত প্রাপ্তির স্বরূপ বুঝতে চাওয়াটাও আমার পক্ষে অস্বস্তিকর ছিল। এই ইট-চাপা ঘাসের আশাহীন জীবনে এমন ঘাসফুল কেন ফুটল?

আপনাকে বহুবছর আগের এক অষ্টমীর রাতে শুধিয়েছিলাম, শিউলির ভাল নাম কী? মনে আছে অবুদা? আপনি কিন্তু বলতে পারেননি।

না।

আজকে বলুন।

আহ্লাদী হাঁসীর মতো বলল হাসি।

জানি না। শিউলির যে ভাল নাম আদৌ আছে তাই তো জানতাম না। শিউলিরও ভাল নাম দরকারই বা কী? তার ডাক নাম তো পচা নয়! আর জানলে তো সেদিনই বলতাম। আমরা যখন অষ্টমীর আরতি দেখে ফিরে আসছিলাম, সেই রাতে তুমি একটি কাঞ্জিভরম সিল্ক পরেছিলে, বাজুবন্ধ, সাতনরী হার, পায়ে পায়জোর...

আমাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে হাসি শীৎকারের সঙ্গে

বলল, আশ্চর্য ! সে-কথাও আপনার মনে আছে ! সত্যি ! অবাক করলেন অবুদা, আপনি আমাকে অবাক করলেন । কতবছর আগের কথা ? বছর কুড়ি তো হবেই কম করেও । তাই না ? অনেক বেশিও হতে পারে ।

বলেই, হাসি যেন হঠাৎই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে চুপ করে গেল ।

আমি বললাম, বললে না ?

কী ?

শিউলি ফুলের ভাল নাম কী ?

ও । হরশৃঙ্গার ।

হাসি বলল ।

তারপর বলল, ইন্দিরা দেবীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর একটি চিঠিতে পড়েছিলাম ।

তাই ?

হ্যাঁ । তারপর আবাব বলল, মুখে চোখে জল দিয়ে নিন, তাবপর চলুন বাগানে বসে চা খাবেন । দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়েছে । এখন আকাশ পরিষ্কার । আপনার জন্যে সিঙাড়া ভেজেছি । আনিয়েছি পান্তুয়া । এখানের কালোর দোকানের আর ঘোষের দোকানের মিষ্টি খুব ভাল । দুধ ভাল তো !

তাই ?

হ্যাঁ ।

তারপর বলল, আপনি কিসমিস এবং কাজু দেওয়া ঝাল-ঝাল সিঙাড়া খেতে ভালবাসতেন তাই ওইরকমভাবেই করতে বলেছি । গড়ে দিয়েছিল প্রকাশই, রান্নার লোক, কিন্তু ভেজে আনছি আমি গরম গরম । আপনি কড়া ভাজা খেতে ভালবাসতেন, শুকনো-শুকনো, তেল-ঘি জবজবে নয় ।

তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, আমারও মনে আছে কিছু কথা ।

বাগানে গিয়ে বসবেন, মুখ-চোখ ধুয়ে, আমি আসছি ।

বলেই, চলে গেল ও ।

চোখ মুখ ধুয়ে আমি বাগানে বেরিয়েই দেখি একটি ছোট কিন্তু ঝাঁকড়া গাছের তলাতে নয়, পাশে সাদা রঙ-করা বেতের চেয়ার পাতা, সামনে একটি গোল টেবিল । তলাতে এই জন্যে নয় যে, তখনও গাছ-গাছালির পাতা থেকে জল ঝরছে । রঙ্গন ফুলেদের মুখে জল টলটল করছে । যদি হঠাৎ বৃষ্টি আসে, তাই প্রকাণ্ড বড় একটি

লাল-নীল-সবুজ ছাতা পোঁতা আছে টেবল-চেয়ারের পাশে।

সত্যিই গদাই-এর বাড়িটি ছবির মতো। কোথাও কিছু খামতি নেই।

বৃষ্টি থেমেছে বটে কিন্তু বেশ গুমোট করেছে। হাওয়া নেই। রাতে বোধ হয় আবার বৃষ্টি হবে। বাগানের গন্ধরাজ আর চাঁপাফুলেরা গন্ধ উড়িয়েছে। থোকা থোকা রঙ্গন আর লালপাতিয়া আর পাতাবাহার। এদের গন্ধ নেই কিন্তু চোখের মধ্যে হোলি খেলে এরা রঙ ছুঁড়ে ছুঁড়ে। হাওয়া থাকলে হয়তো বাতাবি লেবুর গন্ধও পাওয়া যেত।

এত রকম গাছ-গাছালিও চিনেছিলাম সেই কবে! কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়াতেই। তবে যে গাছ-পাশে এখন বসে আছি, সে গাছ আগে দেখিনি। বইয়েই পড়েছিলাম। রতনই নাম বলল, জিজ্ঞেস করাতে। বলল, "চেরী"।

টেবলের উপরে ধবধবে সাদা ইস্ত্রি-করা টেবল-ক্লথ পাতা। চারখানি প্লেট একপাশে রাখা, একের পর এক। মোটা রঙিন রুমাল, ইস্ত্রি-করা, ভাঁজ করে রাখা আছে। একেই কি ন্যাপকিন বলে? বোধহয়। কাঁটা চামচ।

চা এবং খাবার নিয়ে পরে আসবে হাসি।

নানারকম পাখি ডাকছিল। আমি পাখি চিনি না। কাক, চিল, চড়ুই, কোকিল ছাড়া। বড় গাছও তেমন চিনি না। আম, কাঁটাল, লিচু, কৃষ্ণচূড়া, কনকচাঁপা ইত্যাদি ছাড়া। গাছ-গাছালির সঙ্গে সম্পর্কই চলে গেছে। তাই বোধহয় জীবনটাও এমন মরুভূমির মতো হয়ে গেছে, শুধু কাঁটাঝোপ আর ক্যাকটাসেতেই ভরা। পনেরো বছর আগে একবার বটানিক্যাল গার্ডেনে গেছিলাম ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে। সারাদিন ছিলাম। বড় ভাল লেগেছিল। প্রকৃতি বোধ হয় মানুষের মনে অনেক শুভ বোধের জন্ম দেয়। প্রেম জাগায়।

নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এই যে হাসি আজও মনে করে রেখেছে যে, শিউলিফুলের ভাল নাম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল এক অষ্টমীর রাতে, আমি মনে রেখেছি বহুবছর আগের এক পুজোর রাতে ও কি পরেছিল; ও মনে করে রেখেছে আমি কিরকম সিঙাড়া খেতে ভালবাসি—এই মনে রাখাকেই কি ভালবাসা বলে? এই মধুর স্মৃতি? একের অন্যের প্রতি এই গভীর বোধ? একে, অন্যের কাছে এলেই এক দারুণ ব্যাখ্যাহীন প্রত্যাশাহীন ভাললাগা। এই সব যখন মরে যায়, তখন ভালবাসাও কি মরে যায়?

মনে পড়ে গেল, ঝাবুর শ্বশুরবাড়িতে হাসিকে অপ্রত্যাশিতভাবে এতদিন পরে দেখে আমার বুকের মধ্যেটা কেমন যে করে উঠেছিল, সেই কথা। সেই তীব্র আনন্দ এবং বেদনা-ভরা অনুভূতি আমার হৃদয়ে যেন ছুরিকাঘাত করেছিল। কলম্বাসও বোধ হয় আমেরিকা আবিষ্কার করে এত খুশি হননি আমি যতখানি হয়েছিলাম হাসিকে সেদিন সকালে আবিষ্কার করে।

মামাবাড়ির সঙ্গেও যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে। সে-বাড়িও ভাগাভাগি হয়ে গেছে। হাসিদের বাড়িতেও তাই। বাগানও আর নেই। ফুল ফোটে না, পাখি ডাকে না, মালিনীও আর ঘোরে না বাগানে। সেখানে প্রোমোটার পাঁচতলা বাড়ি বানিয়েছেন। হাসির কাকা এবং জ্যাঠতুতো দাদারা কলকাতার কাছে নিউ ব্যারাকপুরে আর খড়দাতে বাড়ি করে চলে এসেছেন। কৃষ্ণনগর থেকে যাওয়া-আসার অসুবিধে।

মেজমামির কাছে শুনেছিলাম যে, মুখ দেখা-দেখি নেই তাঁদেব মধ্যে। কেন যে এমন হয় তা কে জানে! এই কলকাতা শহরটাই সমস্ত বাংলার মফস্বল শহরগুলিকে এবং গ্রামকে শ্রীহীন এবং ভালবাসাহীন করে তোলার জন্যে দায়ী।

হাসি এল। ড্রাগন-আঁকা সুন্দর একটি জাপানি চায়ের পট এবং একটি গরম টুপির মতো কী একটা জিনিস—ট্রেতে করে রতন নিয়ে এল। পেছনে পেছনে অন্য একজন কাজের লোক, সম্ভবত মালীদেব মধ্যে একজন, ট্রেতে করে পান্তুয়া আর সিঙাড়া। কাঁটা-চামচ, চায়েব চামচ এ-সবও এল। চায়ের চারকোণা কৌটো। মকাইবাড়ি টি-কোম্পানির।

হাসি চেয়ার টেনে বসে, প্লেটগুলি ট্রে থেকে নামিযে কাঁটা-চামচ এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন, খেয়ে নিন অবুদা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রান্নার লোক প্রকাশ চায়ের ট্রেটা তুলে নিয়ে গেল। কাপ-ডিশ রইল টেবিলেই। তারপব ফুটন্ত জল কেটলিতে ঢেলে সেই টুপিটা দিয়ে কেটলিটা ঢেকে—(বুঝলাম যে এই টুপির মতো জিনিসগুলিকেই সম্ভবত "টি-কোজি" বলে, ইংল্যান্ডের এবং রাশিয়ার পটভূমিব গল্প-উপন্যাসে পড়েছিলাম বটে) টি-কোজি তুলে, তাতে দু-চামচ চা ফেলে দিল হাসি মকাইবাড়ির চায়ের কৌটো থেকে। তারপর বড় চামচে দিয়ে নাড়িয়ে আবারও টি-কোজি দিয়ে ঢেকে রাখল।

হাসি বলল, দার্জিলিং-এর চা আপনার পছন্দ তো?

হেসে বললাম, আমরা ব্রুকবন্ড-এর গুঁড়ো চা খাই। গরিব

কেরানিদের যৌথ পরিবার। তার আমাদের আবার দার্জিলিং আর আসাম। সকালবেলাতে একটু গরম জল খাওয়ার অভ্যেস। আমার চরিত্রই তুমি খারাপ করে দিলে ! এত কিছুর চয়েস তো আমার নেই। তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। নিজের চোখে দেখলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, গদাই তোমাকে যা দিয়েছে তা খুব কম মানুষই দিতে পারে। আর আমার তো...

হাসি তীক্ষ্ণ চোখে আমার চোখে চেয়ে রইল।

বলল, আপনি হয়তো জানেন না যে, আমি আপনাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, কান্নাকাটিও করেছিলাম। আপনার মামিমারা জানেন। কিন্তু জ্যাঠামশায়...তিনিই তো আমাদের পরিবারের কর্তা ছিলেন...কিছুতেই রাজি হননি। আপনারা নাকি বড়লোক ছিলেন না।

নাকি আবার কী ! কোনওদিনও ছিলাম না। আজও নেই।

তা ছাড়া যেটা কেউই জানে না, আমি আর আমার মা ছাড়া, জ্যাঠামশায় আপনার মেজমামিমাকে একবার... । যাক সে সব কথা। ওঁর রাগ ছিল ভীষণ আপনার মামাবাড়ির উপরে।

আরও একটা কথা আজও মনে করলে রাগে গা জ্বালা করে। আপনি কী ধরনের পুরুষ বলুন তো অবুদা ! আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে জেনেও আপনি কিন্তু কিছুমাত্রই করলেন না।

আমিও কি পুরুষ ? আমি তো আমার মধ্যে পৌরুষের কিছুমাত্রই দেখি না।

হাসি হেসে বলল, আপনার বন্ধু অশেষবাবুর মতো যাঁরা নিজেদের পৌরুষের ঢাক নিজেরাই ক্রমাগত পেটান তাঁদের চেয়ে আপনি হয়তো বেশি পুরুষ। কে পুরুষ, কে নয়, তা মেয়েদের চেয়ে কেউই জানে না বেশি।

এখন যা-ই বলো না কেন, তুমিও একবারটি জানালেও না আমাকে ! আমিও তো কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি ভাবলাম, আমি তোমাকে ভালবাসলেও তুমি আমাকে শুধুই পছন্দই করো। ওই পর্যন্তই। শুধুমাত্র "পছন্দ" করো এই দাবিটুকুর জোরে কি করে তোমার শুভার্থী হয়েও দারুণ বড়লোক ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়েতে বাদ সাধতে যেতাম বলো ? কী আমার যোগ্যতা আর সামর্থ্য ছিল। তা ছাড়া, এখনকার গদাইকে না জানলে, তোমার সাচ্ছল্যের কথা নিজ চোখে না দেখলে তো বুঝতেও পারতাম না কত বড় ভুল করতাম ! যা হয়েছে এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারত তোমার পক্ষে ? মানে,

তোমার দিক দিয়ে।

হাসি স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

কেন স্তব্ধতা, তা বুঝলাম না।

তারপর বলল, আপনিও এই কথাই বললেন! যে কথা আমার বাপের বাড়ির সকলে, আমার বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকেই বলে, সেই কথাই!

তো?

না।

না মানে? চুপ কবে গেলে কেন?

না। আপনার কাছ থেকে আমি অন্য কিছু শুনব ভেবেছিলাম।

তাই? কী শুনবে ভেবেছিলে হাসি?

তারপর বললাম, যে পুরুষ গরিব তার দুঃখ যে কী তা তুমি বুঝবে না। দরিদ্রর পৌরুষ কাচের আলমারির মধ্যে রাখা হাতির দাঁতের গয়নারই মতো। জীবনে কোনও কাজেই লাগে না। যে অক্ষম, সে-ই জানে, এই গ্লানির প্রকৃতি কী?

না, না। আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না অবুদা, তুমিও অশেষবাবুর দলে চলে গেলে! তুমিও আমাকে বুঝলে না।

কিসের দুঃখ তোমার? সব মন গড়া দুঃখ।

আমি বললাম।

হ্যাঁ। মকাইবাড়িব চা, এয়াব-কন্ডিশানড, লনওয়ালা বাড়ি, বেয়ারা, বাবুর্চি, গাড়ির সারি এ-সবেব বাইরেও একজন মানুষের চাইবাব অনেক কিছুই থাকে। আপনি আমার বিয়ের সময়ে যদি জানতেন যে আপনাব বন্ধু গদাই-এর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে তা হলে কী করতেন আপনি? নিশ্চয়ই মানতেন যে অশেষবাবুব কোনও মতেই, মানে; রুচি, শিক্ষা মানসিকতা কোনোওদিক দিযেই আমাব স্বামী হতে পাবাব যোগ্যতা ছিল না। যদি জানতেন, তখনও কি পালিয়েই থাকতেন? আমাকে ছেলেবেলা থেকে জেনেও আপনি...কিছু করলেন না, আমার জন্যে কিছুই করলেন না।

অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল হাসি।

আমি বললাম, জানলে হয়তো গদাইকে খুনও করতে পারতাম। ভাগ্যিস জানতাম না! কিন্তু গদাইকে তুমি বিয়ে করে মরেছ বলে ভাবছ, আর আমাকে বিয়ে করলে হয়তো মৃততব হতে। অর্থ ছাড়া সব প্রেমই শুকিয়ে যায় হাসি। কত দেখলাম। তা ছাড়া, তোমার বিয়ের সময়ে আমি যে-মানুষ ছিলাম, এখন তো আর সে-মানুষ নেই। আমার এই সামান্যতা, নিশ্চেষ্টতা, কলকাতার গলির জীবন,

বনধ,.মিটিং, মিছিল, চারদিকের এই অসার ভণ্ড ক্রিয়াকাণ্ডতে আমি ফসিল হয়ে গেছি হাসি। সত্যিই ফসিল হয়ে গেছি।

কেন এমন বলছেন ? এমন করে কেন বলছেন অবুদা ?

মৃত্যুর অনেক রকম হয় হাসি। তুমি মাত্র এক রকমের মৃত্যুর কথাই জেনেছ। এই পৃথিবীতে অবস্থাপন্ন হওয়ার মতো গুণ আর দুটি নেই। গদাই আমার চেয়ে সবদিক দিয়েই ভাল। ও তো আমার মতো একশো মানুষকে চাকর রাখতে পারে। চাকরের বউ হওয়ার চেয়ে মনিবের স্ত্রী হওয়া সবসময়েই ভাল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল হাসি। দীর্ঘশ্বাস পড়ল মস্ত একটা।

আপনি বিয়ে করলেন না কেন অবুদা ? আপনার প্রত্যেক দাদাই তো বিবাহিত।

বলেই বলল, নিন খান, সিঙাড়া খান। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে। খাওয়ার সময়ে এইসব প্রসঙ্গর অবতারণা করাই ভুল হয়েছে আমার।

সিঙাড়া ভেঙে মুখে দিয়ে বললাম, বিয়ে করার মতো সহজ কাজ আর দুটি নেই বলেই তো করলাম না। এখানে ভিখিরি, অথবা সবদিক দিয়েই অক্ষম মানুষের বিয়ে করতে কোনওই অসুবিধে নেই, তাই। বিয়ে করতে সম্মানে বেধেছিল, তাই। ভাগ্যিস করিনি। কী দিতে পারতাম আমি আমার স্ত্রীকে ?

হাসি মুখ ফিরিয়ে বলল, মিথ্যে কথা বলছেন আপনি। ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন।

মিথ্যে কথা ? না, না।

চমকে উঠে বললাম আমি।

আমার চোখে চোখ রেখে হাসি বলল, সত্যি করে বলুন তো, আমার জন্যেই কি আপনি ব্যাচেলর রইলেন সারাজীবন ?

আমি জোর করেই হাসলাম। বললাম, জানো না তুমি ? "আ ব্যাচেলর ইজ আ স্যুভেনির অফ আ উওম্যান হু হ্যাড ফাউন্ড আ বেটার ওয়ান অ্যাট দ্যা লাস্ট মোমেন্ট।"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, না, সে জন্যেও নয়। আসলে আমি খুবই ভিতু। আগে হয়তো এতখানি ভিতু ছিলাম না। তবে হয়েছি। অনেক বছরই হল। ভয়েই বিয়ে করা হল না। এই আর কী !

আমিই তাহলে আপনার এই একাকীত্বর জন্যে দায়ী !

চমকে উঠে আমি বললাম, একাকীত্ব ? না, না কিসের একাকীত্ব ? চমৎকার আছি। চলো, চা খেয়ে নাও, তারপর হাঁটতে হাঁটতে

তোমাকে বোঝাব যে আমি একটুও একা নই। বেশ আছি। দারুণ আছি। মানে, এক কথায় বললে, বলতে হয়, আমার জীবনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে। এখনও আছে। চিরদিনই আমি বর্তমানেই বাস করে গেলাম। আমার অন্য বন্ধুরা, ইনক্লুডিং গদাই, পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে। গুকুগুকুর কনসাল বা সুতানুটি ক্লাবের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার অথবা একসময়ে প্রেসিডেন্ট হওয়াটাই এখন ওর ভবিষ্যৎ। আমার ভবিষ্যৎ ময়দানের মতো খোলা, আকাশের মতো মেলা। অনেক কিছুই ঘটতে পারে অসামান্যতায়, সত্যিই ঘটতে পারে এখনও আমার জীবনে।

হাসি, ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি আমার দু' চোখের উপরে পুরোপুরি মেলে ধরল, যেমন করে ছাতা শুকোতে দেয় মানুষে রান্নাঘরে, তারপর মুখে কিছু না বলে টি-পট থেকে চা ঢালতে লাগল। ওর ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস ফুটতে-না-ফুটতেই বাগানে ফুটে-থাকা গন্ধরাজ তাকে লুটে নিল।

হাসি বলল, ক'চামচ চিনি ?

দু চামচ।

দুধ ?

দু চামচ।

॥ ১০ ॥

বিকেলে অনেকদূর বেরিয়ে এলাম হাসির সঙ্গে। ভারি ভাল লাগল। আশ্রমের মধ্যেও গেছিলাম। উপাসনাগৃহ দেখলাম। রঙিন কাচের দেওয়াল তার, ছবিতে দেখা প্যারিসের নতরদাম গির্জার দেওয়ালের কাচের মতো। রবীন্দ্রনাথের শ্যামলী, ঘন্টাঘর, শ্রীসদন ; রতনকুঠি। বিখ্যাত সেই আম্রকুঞ্জ।

হাসি বলল, কাল খুব ভোরে উঠে গোয়ালপাড়ার দিকে যাব। ওদিকটা ভারি নির্জন। গাড়ি নিয়ে গিয়ে মোড়ে রেখে দেব। তারপর হেঁটে যাব।

বেশ।

আমি বললাম।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এখানেই থাকতেন শুনেছি। এখনও থাকেন ?

থাকেন বই কী ! ওঁর বাড়ি অ্যান্ড্রুজ পল্লীতে।

সুচিত্রা মিত্রর খবর তো রোজই কাগজে দেখি, ওঁকে টিভিতেও দেখি প্রায়ই, মঞ্চেও, আবৃত্তি করছেন, লিখছেন, আন্দোলন করছেন ! কিন্তু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখি না কেন ?

বলতে পারব না। তবে অনেকেই শিল্পী তো নিভৃতে নীরবেই থাকতে ভালবাসেন। কোনও রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়ে রোজই মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ানো তো সব শিল্পীর কাছ থেকে প্রত্যাশারও নয়।

সুচিত্রাদি এবারে গান গাওয়া বন্ধ করলেই পারেন। করলে, নিজের প্রতি সুবিচার করবেন মনে হয়।

কেন এ-কথা বলছ তুমি ?

নইলে, হেমন্তদার যেমন শেষের দিকে সুর নড়ে যেত, গলা বেসুরো বলত, তেমনই হবে। ওঁকে শ্রদ্ধা করি বলেই বলছি। আমি ওঁর মস্ত ভক্ত।

সেটা অবশ্য ঠিক। অবসর তো একদিন সকলকে নিতে হয়ই।

সকলকেই। খেলোয়াড়কে, লেখককে, গাইয়ে এবং বাজিয়েকেও। কিন্তু শিখরে পৌঁছে অবরোহণ করাটাই বোধহয় ভাল। অপমানে, অসম্মানে অবসর নেওয়ার চেয়ে ? বঙ্গভূমে অতুল্য ঘোষ আর চুনী গোস্বামী ছাড়া অবসর নিতে কেউই জানলেন না বোধহয়।

কথাটা সত্যিই ভাববার। অথচ কাগজে এখনও রোজই পড়ি যে, সুচিত্রা মিত্র দারুণ গাইলেন।

কাগজে যদি লেখে তবে মানতেই হবে যে দারুণই গান। ওঁর মতো শিল্পী কমই হয়েছে। কিন্তু আজও কি দারুণই গান ?

কাগজ কি কোনদিনও মিথ্যে বলতে পারে ?

হাসি বলল।

আমাদের অফিসের পিওন নরেন প্রায়ই একটা কথা বলে, "প্যাপারে লিখছে"। অর্থাৎ, পেপারে লিখেছে। কাগজে যা ছাপে, তাকেই তো জনগণে ধ্রুব সত্য বলে জানে। তাদের কাছে তার চেয়ে বড় সত্য তো আর কিছুই নেই। অশিক্ষিতদের দেশে তেমনটিই তো হবার কথা। খবরের কাগজই তো একমাত্র পাঠ্যবস্তু। কিন্তু মিথ্যাকে চিৎকার করে বা অ্যামপ্লিফায়ারে গগন-নিনাদি আওয়াজে সত্য বলে প্রচার করলেই তো আর মিথ্যা সত্যি হয়ে যায় না। মিথ্যা, মিথ্যাই থাকে, চিরদিনই মিথ্যা থাকবে। সব মিথ্যাই।

হাসি বলল, খবরের কাগজওয়ালাদের পক্ষে তো দিনকে রাত, রাতকে দিন, শিবকে বাঁদর, বাঁদরকে শিব করা হাতের পাঁচ। সব

কথাই সাধারণে বিশ্বাস করে বলেই তো মানুষকে এই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতদের দেশে ভুল পথে চালিত করতে ওদের মতো পারঙ্গম আর কেউই নয়।

তারপর হাসি বলল, মৃদুস্বরে, যাক গে এ-সব আজে বাজে কথা। এখানে যদি বসন্তোৎসবের সময়ে কখনও আসেন, তাহলে নেদেরপাড়ার কথা মনে পড়ে যাবে। খুবই মনে পড়বে।

কেন ?

কাঁটালের মুচির গন্ধ ভাসবে বাসন্তী বাতাসে, আমের মুকুলের গন্ধ ; শালফুলের গন্ধ। পরিবেশে একটা রুখু রুখু ভাব। কাঁচা কলাইয়ের ডাল, আলু-পোস্ত আর ঘরে-পাতা দই, জোয়ান আর নুন দিয়ে. .

ইসস। আর বোলো না হাসি। নেদেবপাডার দিনগুলোব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

নস্টালজিক গলাতে আমি বললাম।

সত্যিই বড় মন খারাপ হয়ে যায় সেই সময়ে এলে। আব পূর্ণিমাব চাঁদটা যা ওঠে না।

নেদেরপাড়াতে তো শালফুলের গন্ধ ছিল না। শালগাছ ছিল কোথায় সেখানে ?

নেদেরপাড়াতে ছিল না কিন্তু বীরনগবে ছিল। যেখানে লালগোলা প্যাসেঞ্জারের ক্রশিং হত। মনে নেই ? আপ আর ডাউন ট্রেনের ? বীরনগর স্টেশনের দুপাশেই শাল-জঙ্গল ছিল না ?

শাল, না সেগুন ?

কী জানি ! অত কি আমি জানি ! তবে ওসব তো জঙ্গলেরই গাছ। জংলি গাছের বিশারদ আমি নই। ওই সরু সরু জংলি বাঁশ আমাকে এনে দিয়েছেন একজনে অচানকমারের জঙ্গল থেকে। আমি যাইনি কখনও মধ্যপ্রদেশে।

॥ ১১ ॥

রাতে যখন খেতে বসেছি আমি আর হাসি, ঠিক তখনই গেটের কাছে সাইকেল-রিকশার ক্রিং ক্রিং শোনা গেল।

এই সাইকেল-রিকশার আওয়াজও ভীষণ নস্টালজিক করে দিয়েছিল আমাকে।

"কেস্টলগর সিটি" লেখা থাকত স্টেশনে, হলুদের ওপরে কালো

দিয়ে। লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বা লোকালে কৃষ্ণনগরে পৌঁছে, স্টেশনে নেমেই সাইকেল-রিকশাতে চড়তাম। তারপরে ক্যাঁচোর-কোঁচোর, কিরিং-কিরিং।

এই শব্দমঞ্জরীর সঙ্গে যেন আমার আস্ত ছেলেবেলাটার কিছু কিছু মধুর পরিচ্ছেদ, মামাবাড়ি, চড়কের বা রথে'র মেলা, দশমীর রাতের প্রতিমাভাসান, মামাবাড়ির সব মানুষ, লঘু ও গুরুজনেরা আমার মাথার মধ্যে উঠে এলেন। উঠে এলেন হাসিদের বাড়ির সকলেও।

মনে পড়ে গেল, আশ্চর্য! এই সাইকেল-রিকশার আওয়াজেই ; হাসির এক প্রাচীনা ঠাকুমা ছিলেন। বুড়ি নড়তে চরতে পারতেন না। দোতলার বারান্দাতে, সকাল হলেই তাঁকে ধরাধরি করে এনে বসানো হত। বসে থাকতেন একটি বেতের চেয়ারে। বাতের ব্যথাতে কঁকিয়ে কাঁদতেন সবসময়ে। একজন আয়া তাঁকে তেলমালিশ করত, হট-ওয়াটার ব্যাগ দিত, আর তিনি পাঁচমিনিট অন্তর অন্তর হাসির জ্যেঠিমাকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "অ বডবউ, বড়বউ, ক'টা বাজে গা" ? সঙ্গে সঙ্গে দোতলার বারান্দাতে ঝোলানো খাঁচায় বসে-থাকা ময়না তাঁকে ভেঙাতো : "ক'টা বাজে গা" ? ক'টা বাজে গা ?" বলে।

বুড়ি বলতেন, "মরগা তুই।"

ময়নাও বলত : "মরগা তুই !"

কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়া থেকে আবার ফিরে এলাম শান্তিনিকেতনে।

হাসির রান্নার লোক প্রকাশ রান্নাঘর থেকে গরম গরম লুচি ভেজে আনছিল আর রতন খাবার টেবলের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

সাইকেল-রিকশার ঘণ্টা শুনে হাসি বলল, যাও তো রতন, দ্যাখো কে এল এই অসময়ে এত রাতে। ভজহরিবাবুও হতে পারেন। মানুষটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

ভজহরিবাবু কে ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আপনার বন্ধুর পেয়ারের কন্ট্রাক্টর। গ্রিলের দোকানও আছে। আমি একা এসেছি শুনলেই ওঁর রাত-বিরেতে আসা চাই। আজ আপনাকে দেখে হতাশ হয়ে চলে যাবেন। নইলে, তাঁর মুখে খই ফুটবে। মানুষটার চোখের দৃষ্টি আমার ভাল লাগে না। আপনার বন্ধুকে যদি কখনও বলি কী যে ঘটে যেতে পারে মানুষটি জানেন না।

আমার চোখের দৃষ্টি তোমার খারাপ লাগে না তো ?

ভর্ৎসনার গলাতে হাসি বলল, অবুদা !

ভারি ভাল লাগল আমার ওর ওই ছদ্ম বকুনিটা !

তারপর বিরক্তির গলাতে বলল, মালিটা দিনকে দিন বোকা হচ্ছে। গেট থেকেই বিদায় করে দেবে, তা নয়।

একটু বাদেই মোরামের ড্রাইভওয়েতে রাবারের চটিতে কুড়মুড় শব্দ তুলে রতন দৌড়ে এল হাতে ছোট একটি ব্যাগ নিয়ে। উত্তেজিত হয়ে, বড় বড় চোখ করে বলল, সায়েব এয়েছেন। সায়েব।

সাহেব ?

অবাক হল হাসি।

পরমুহূর্তেই স্বগতোক্তির মতো বলল, কী যা তা বলিস ! তিনি তো বিদেশে। আর এলেনই বা কীসে ? এই সময়ে ? রিকশা চড়ে ? যত্ত সব।

রতন বলল, কেন ? দার্জিলিং মেল-এ। দার্জিলিং মেল সব সময়েই লেট-এ চলে।

এমন সময়ে গদাই ঢুকল।

মনে পড়ে গেল যে আমাদের স্কুলের থিয়েটারে গদাই মঞ্চে ঢুকলেই আমরা বলতাম ভীম হস্তে গদার প্রবেশ।

ও হাসির সঙ্গে রতনের কথোপকথন শুনে থাকবে।

বলল, পাখা থাকলে, উড়ে আসতাম। নেই বলেই ট্রেনে আসতে হল।

আমার গলাতে ফুলকো লুচি আটকে গেল। তুতলে বললাম, তুই নাকি স্টেটস-এ।

ছিলাম। তবে পরশুই ফিরেছি দেশে। কাল বম্বে থেকেই ফোন করেছিলাম। হাসি আর তোকে একটু ভড়কি দিলাম। তুই হলি কিনা আমার ন্যাংটো-পোঁদের বন্ধু, গুটলুর ভাষায়। প্রথমবার এলি হাসির শান্তিনিকেতনের বাড়িতে, যত্ন-আত্তির সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে কি না তাই দেখতে এলাম। তোর জন্যে হুইস্কি নিয়ে এসেছি একটা। গ্লেনফিডিশ।

তুই তো জানিস, আমি খাই না। ওই নামও শুনিনি জন্মে।

কী বলব ভেবে না পেয়ে আমি বললাম।

জানি। তবে আজ খাবি। হুইস্কি খেলে পেটের কথা বেরিয়ে আসে হড়হড় করে।

কী কথা ?

সন্দিগ্ধস্বরে বললাম আমি।

সত্যি কথা বলতে কি, একটু ভয়ভয়ও করতে লাগল।

ও বলল, আহা! বেরোবেই যে তার মানে কী? যদি কোনও কথা থাকে তবেই তো বেরোবে। নাই যদি থাকে তো বেরোবেটা কী?

তারপরেই বলল, আমি কালই আবার ফিরে যাব শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসেই। দুপুরে। বম্বের ফ্লাইট ধরব সন্ধেতে। সেখানে দুদিন থেকে, ব্যাঙ্গালোরে যাব।

জনস্টনরা আসছেন না?

হাসি জিজ্ঞেস করল।

না।

বলেই, বলল, এলে কি তুমি খুশি হতে?

আমার খুশি-অখুশি নিয়ে আবার কবে থেকে মাথাব্যথা শুরু হল আপনার।

বলেই বলল, রতন, বাবুর কি লাগবে দ্যাখ। আর সাহেব কী খাবেন তা প্রকাশকে বল, জিজ্ঞেস করে যাবে।

গদাই বলল, যা রান্না হয়েছে তাই খাব। কিন্তু আমার জন্যে আগে জল, বরফ আর গেলাস নিয়ে আয়। হুইস্কি আছে ওই ব্যাগেই।

তারপরই হাসির দিকে ফিরে বলল, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু বাড়িটা তোমার। কতদিন পরে এলাম।

আমাকে বলল, তোদের নেদেরপাড়ার মানুষমাত্রই রুচি কিন্তু খুবই ভাল। বুঝলি পচা।

আমার নেদেরপাড়া নয়। আমার মামাবাড়ি ছিল নেদেরপাড়ায়।

ওই হল্ল। রুচি ভাল না হলে তোর হাসিকে ভাল লাগে! আর হাসির তোকে।

হাসি বলল, খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাক আমাদের। তারপরে ঘরে গিয়েই না-হয় তোমার মুখটা খুলো।

আমি শান্তিনিকেতনী মানুষ নই। আমার কোনও ভিতর-বাহির নেই। ঘোমটার তলায় খ্যামটা নাচি না।

ইসস। কী ভাষা।

আমি বললাম, "শান্তিনিকেতনী মানুষ" বলে যদি কোনও বিশেষ প্রজাতি থাকতেন অথবা কামাচকাটকার বা লিলিপুটের দেশের মানুষদেরও যদি বিশেষ প্রজাতি বলে চিহ্নিত করা যেত তবে কিন্তু তারা তোর বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দিতেন কোর্টে।

আরে দিলে দিত। করুণাবাবুকে রিটেইন করে রেখেছি। কিছু

মামলা অন্তত না হলে যে টাকাটাই মাসে মাসে বেকার যাবে। একটু খাটা-খাটনি করুক শালা।

হাসি বলল, ভাষার কথা বলছিলাম আমি।

যেমন শিক্ষা-দীক্ষা-ভাষাও তো তেমনই হবে। তা ছাড়া, ভাষা তো তুমি বের করে নাও আমার ভিতর থেকে। বাহাদুরিটা তো তোমারই!

আমি বললাম, এমন করে কি বাঁচা যায় গদাই? এত তিক্ততা নিয়ে?

তুই চুপ কর শালা।

আমাকে চমকে দিয়ে ধমকে দিল গদাই।

তারপর বলল, মেলা জ্ঞান দিস না। খাওয়া শেষ হলে চ' তোব ঘরে গিয়ে গ্যাঁজাব। কাল তো একটার সময়ে চলেই যাব। তাবপব তোরা দুজনে আর্ট-কেলচার-গানা-বাজানা করিস।

বলেই বলল, ওরে, অ্যাই ছোকরা, সাহেবের জন্যে সুইট-ডিশ কী করেছে তোদের বাবুর্চি?

হাসি বলল, ওর নাম রতন, আব বাবুর্চিব নাম প্রকাশ।

নাম যার প্রকাশ, তারও পেকাশিত হতে এত সময় লাগে কেন?

রতন বলল, কী সুইট-ডিশ করতে বলব সায়েব আপনাব জন্যে?

আবে ইডিয়ট। আমার জন্যে কে বলেছে? আমার ছেলেবেলাব বন্ধু এই সাহেবের জন্যে। কেন, ইনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এয়েচেন বলে কি ইনি সাহেব নন। সাহেবের বন্ধু মাত্রই সাহেব। বুঝেছিস।

হ্যাঁ, সায়েব।

ঠিক ঠিক বুঝেছিস তো!

হ্যাঁ সায়েব।

বাবুর্চি প্রকাশ বাইরে এসে বলল, আজ্ঞে কাস্টার্ড ক্যারামেল।

কাস্টার্ড ক্যারামেল তো পাইস-হোটেলেও পাওয়া যায়, তার জন্যে বাবুর্চির কী দরকার? আর কোনও সুইট-ডিশ করতে জানো না?

হ্যাঁ।

কী?

ব্যানানা ফ্রিটার্স।

হতভাগা। কলার পিণ্ডি। ছিঃ ছিঃ। বাবরির ঘটা তো আছে খুব। যাত্রা-টাত্রা করো নাকি? তুমি কী কী সুইট ডিশ করতে পার তার লিস্ট কাল লিখে দেবে আমাকে।

হাসি গলা নামিয়ে বলল, এত বাড়ি হয়ে গেছে এখানে, বড় বড়

লোকের। মানে পয়সাওয়ালা লোকের, যে লোকজন পাওয়া ভারি মুশকিল। পাওয়া গেলেও রাখা মুশকিল অথচ...।

বলেই, বিপন্ন মুখে আমার দিকে তাকাল হাসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন পয়সাওয়ালা লোক আর বড়লোকে কোনও ফারাক নেই। পয়সা থাকলেই লোকে বড়লোক।

আমি যে কত সাধারণ, কত অসহায় তা গদাই-এর সামনে বুঝতে পারলাম নতুন করে। আমার যে মাত্র একজন ফুল-টাইম কাজের লোক রাখারও সামর্থ্য নেই।

বললাম, গদাই-এর দিকে চেয়ে ; তুই কি এদিকে অনেকদিন আসিসনি না কি ?

এসেছিলাম, গৃহপ্রবেশের সময়ে, সাত বছর আগে।

তারপরে আর আসিসিনি ?

কী করে আসব ? আমাকে খেটে খেতে হয় রে পচা। ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্টের কেরানির চাকরি পাওয়ার মতো সৌভাগ্য তো করে আসিনি যে সই করেই মাইনে পাব। খেটে খেতে হয়। তোমাদের আর্ট-কেলচার বড় বড় বোলচাল যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্যে সাপ্লাই লাইন অব্যাহত রাখতে হয়। কেউ এই দুনিয়াতে কুকুরের মতো খাটতে আসে, আর কেউ-কেউ আয়েস করতে ; আর্ট-কেলচার করতে।

যাঁরা খাটেন তাঁরাও আর্ট-কালচার করেন অনেকে।

ছাড়। জানা আছে। আমার কলকাতার বাড়িতে আসিস, দেখবি যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, রামকিংকর, জয়নাল আবেদিন, প্রকাশ কর্মকার, যোগেন চৌধুরী, শ্যামল দত্ত রায় আরও কত্ব সব ডাঁই করা আছে। ওরিজিনাল কালেক্টরের সোর্সও এক্সপ্লেইন করতে হয় না। এস্টেট ডিউটি নেই, ওয়েল্থ ট্যাক্স নেই। দু নম্বর টাকা ইনভেস্ট করার এমন সহজ পথ আর দুটি নেই। এখন যার যত দু' নম্বরের টাকা সে তত বড় আর্ট কালেকটর। দাঁড়া না, আরও কিছু ছবি কালেক্ট করি, দেখবি তারপর একটা আর্ট গ্যালারিও খুলব। যার পকেটে মাল আছে, সে মাল তুই যেমন করেই কামিয়ে থাকিস না কেন ; তার উঠোনে সব আর্ট-কেলচার করনেওয়ালারা বকনা বাছুরের মতো বাঁধা থাকে। টাকা করার পরেই তো আর্ট-কেলচার, ক্ষমতা এসবের দরকার পড়ে। নইলে লোকে তাকে বলে, "অশিক্ষিত বড়লোক," তারা যদি আমার মতো সত্যি অশিক্ষিত নাও হয়। আমাকে অশিক্ষিত বড়লোক বলবে, এমন সাহস কোন শালার

আছে ?

তুইই একমাত্র বন্ধু গদাই, যার ভাষার অবনতি হয়েছে দেখছি, স্কুল ছাড়বার পরে।

স্কুল আর ছাড়তে পারলাম কই ? আমি তো ফেল করেছিলাম স্কুল ফাইন্যালে। তারপরেই তো জীবনের স্কুলে ভর্তি হলাম রে। স্কুল-কলেজ যা দেখিস সে সব তো খেলার স্কুল। খেলার পরীক্ষা। আসল হচ্ছে জীবনের পরীক্ষা, The battle of life! তা ছাড়া, বাংলায় কথা আজকাল বলে কে ? বাংলা বলি যখন গালাগালি করতে ইচ্ছে হয়, তখনই।

আমি উঠছি, বুঝলে হাসি।

হাসি আর আমি জীবনের পথে এতদূর অবধি ভিন্ন ভিন্ন পথে হেঁটে এসেছি যে আমার পক্ষে ওকে আর বাঁচানো সম্ভব ছিল না। ওর যুদ্ধ ওকে একাই লড়তে হবে। যদি ও লড়তে চায় আদৌ।

হাসি বলল, আমিও উঠছি।

গদাই বলল, তোর এই থার্ড ক্লাস ক্যারামেল কাস্টার্ড খেয়ে কাজ নেই। বুঝলি পচা, মিষ্টি খা। অ্যাই ছোকরা, স্বপন।

আজ্ঞে আমি রতন।

ওই হল্লো। ফ্রিজ-এ কোনও মিষ্টি নেই ? তোর মেমসাহেব কি এমনি করেই আমার ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখাশোনা করছে নাকি ?

আমি বললাম, বিকেলে গরম গরম পান্তুয়া খেয়েছি। চমৎকার। আর খাব না রে। মিষ্টির খুব একটা ভক্ত আমি নই।

ঠিক আছে। যে-জিনিসের ভক্ত তাই খেয়ো। তোমাকে ঠেকাচ্ছেটা কে ? এখন খাওয়া হয়ে থাকলে চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি।

তুই চান করবি না ?

না। শোওয়ার ঠিক আগে আমি চান করি।

যে ঘরে আমি দুপুরে বিশ্রাম করেছিলাম সেই ঘরেই এলাম আমরা।

রতন সাদা-রঙা একটা রট্-আয়রনের ট্রলিতে করে জলের বোতল, বরফ ইত্যাদি ঠেলে নিয়ে এসে দিয়ে গেল।

গদাই বলল, বরুণ, আমি রাতে কিছু খাব না।

আমি বতন সাহেব।

রতন বলল।

সে কি আর বুঝিনি এতক্ষণে। রতনে রতন ঠিকই চেনে। যাও

তোমার মেমসাহেবকে বলে দাও যে, অশেষবাবু রাতে কিছু খাবেন না।

অশেষবাবু কে সাহেব ? এই সাহেবের নাম তো অবুবাবু।

অশেষবাবু কে, তা তোমার মেমসাহেব জানেন। আর সায়েবরা কোনওদিন বাবু হন না। আমাকে, কি আমার কোনও অতিথিকে ককখনও বাবু বলে ডাকবি না। বুয়েচিস !

হ্যাঁ।

কী বুয়েছিস ?

বাবু বলব না।

তারপরই রতন বলল, তবে কি ভজহরিবাবুকেও বাবু বলব না ?

যারা বাবু তাদের বাবু বলবি বই কী ! ওই পাশের বাড়ির খগেনবাবু বা মোড়ের মনিহারী দোকানের পটলবাবু।

রতন খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলল, কী করে চিনব সায়েব, কে সায়েব আর কে বাবু ?

তোর দেশ কোথায় ?

ঝাড়গ্রামের কাছে শালবনীতে।

অ। তা কাজুবাদামের বনে বাস করো, চিতি আর ঢোঁড়াতে তফাত বোঝো না ? সায়েব দেখলেই বোঝা যায়, সে যদি লুঙি পরে গামছা কাঁধে নিমডালের দাঁতনও ঘষে, তবুও বোঝা যায়। সায়েবদের গায়ে এক রকমের গন্ধ থাকে আলাদা। খাটাশের গায়ের গন্ধের মতো।

আমার মনে হল, আমি যদি রতন হতাম তো এখুনি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ধুত্তোর বলে চলে যেতাম। কিন্তু আমারই মতো, অথবা রতনেরই মতো চাকরি যারাই করে, তারাই জানে, কত অসহায় তারা। কত নিরুপায় হলে যে-কেউ পরের চাকরি করে, সে চারশো টাকাই মাইনে পাক কী চল্লিশ হাজার। চাকর, সবসময়ে চাকরই। মনিবমাত্ররই হুল থাকে, দাঁত থাকে, নয়তো থাকে অজগরের মতো নির্লিপ্ত আপাত ঔদাসীন্যর, মহত্ত্বর মুখোশ। অনেক মালিকের সঙ্গে আবার রক্তকরবীর রাজার কোনও তফাত নেই। নিজে চাকর না হলে মালিকের স্বরূপ বোঝা সত্যিই ভারি মুশকিল। "চাকর" বলে কারওকেই ঠাট্টা করতে নেই।

তারপরই ভাবলাম, ও বুঝবে কী করে ! গদাই যে কারও চাকরি করেনি কোনওদিন, ও এ-সব কথা জানবে কী করে !

রিমোট-কন্ট্রোল বেলটা দিয়ে গেল হাতের কাছে রতন। বলল,

দরকার হলে ডাকবেন সায়েব।

আলবত ডাকব।

রতন চলে গেলে, টাইটা এক টানে খুলে ফেলে জামার বোতামগুলোও খুলল গদাই। জুতোটা খুলতে গিয়েও থেমে, বেল টিপল।

রতন এলে, বলল, এই নিরঞ্জন, জুতো খোল।

রতন আর এবারে আর তাকে গদাই অন্য নামে ডাকাতে প্রতিবাদ করল না। এ মানুষটা তার বাবা-মায়ের দেওয়া নামটা খারিজ করে দেবেই যে, সে-বিষযে সে নিঃসন্দেহ হল। নিচু হয়ে বসে জুতো খুলতে লাগল যখন রতন, গদাই নিবিষ্টমনে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জুতো মোজা খোলা হলে, গদাই বলল, যা, জায়গাতে নিযে গিযে রাখ।

ও চলে গেলে আমি বললাম, ওব মুখে তুই কী দেখছিলি অমন করে?

হাঃ। হেসে উঠে, গদাই বলল, লক্ষ করেছিস তা হলে! দেখছিলাম ওব মধ্যে ডেঞ্জাবাস "মনুষ্যত্ব" কতখানি বেঁচে আছে? অথবা আদৌ বেঁচে আছে কি না! থাকলে, শঙ্খচূড় সাপেরই মতো কোনওদিন মালিকের কপালে ছোবল মারতেও পারে। মনুষ্যত্ব, ঘুমন্ত অবস্থাতে থাকাটাও ডেঞ্জাবাস। আমি বিসক নেওয়ার পক্ষপাতী নই। মনুষ্যত্বহীন, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন চাকরই হচ্ছে সেফ চাকব; বেস্ট চাকর।

কী দেখলি?

নেই। গুড রিক্রুট। তোর গার্ল-ফ্রেন্ডেব বুদ্ধির কোনও তুলনাই নেই। শুধু প্রেমিক বাছতেই ভুল করল। ইটস আ পিটি।

গদাই যেন আমার মনের কথাই বুঝে নিযে বলল, তুই হযতো ভাবছিস পচা যে, তোকে বা রতনকে, তোরা পরের চাকরি করিস বলে ছোট করছি। আসল কাবণটা কিন্তু তা নয়। ইচ্ছে করে মিনিটে মিনিটে ওর নাম ভুলে গিয়ে ওকে আননার্ভড করে দিচ্ছি। ও আমাকে এই প্রথমবার কাছ থেকে দেখছে কি না! গৃহপ্রবেশের সময়ে ও ছিল না। আমাকে রিকশা থেকে নামতে দেখেই ও বুঝে নিয়েছে যে আমিই ওর মালিক। ভাল চাকরেরা, আগে না দেখে থাকলেও মালিককে দেখামাত্রই চিনে নেয়। আমি যেমন কাস্টমার চিনি। দ্বিতীয়ত, কথাতেই বলে না, শাদীর প্রথম রাতে মারিবে বেড়াল।

নিজের বিয়ের রাতে বেড়াল যে মারিনি সেটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। সেই ভুলের খেসারত জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে জীবনভর দিয়ে চলেছি। বিয়ের রাতে মারিনি বটে বিড়াল, কিন্তু আজ মারব।

আমাকে মারবি তো! মারলে তাড়াতাড়ি কর। রতনের মতো আমাকে আননার্ভড করিস না। আমি তোর চাকর নই।

না। আমি জানি তা। তুই আমার বউয়ের চাকর। তোর বুদ্ধি আছে পচা! নো-ওয়াণ্ডার। তুই গদাই-এর ন্যাংটো পোঁদের বন্ধু, বোকা তুই হতে পারিসই না।

গদাই হুইস্কিটা শেষ করে, বোতলটার ছিপি খুলে আর একটা ঢালল বড় করে।

আমাকে বলল, নে না একটা। মাল-ফাল খেতে বসে কোনও টিটোটালার সঙ্গে থাকলে কিন্তু কিন্তু লাগে। তা ছাড়া, হংসমধ্যে বক যথা যারা, সেই মানুষগুলোই মহা খসসর হয়।

আমি বললাম, খাই না। জীবনে কখনও হুইস্কি খাইনি।

দূর শালা। কোনওদিন বলবি, জীবনে কোনওদিন পরমকম্মোও করিনি।

ওর শব্দ চয়নে বুকে একটা ধাক্কাও খেলাম।

সামলে নিয়ে বললাম, বিশ্বাস কর, সত্যিই করিনি।

গদাই বলল, গ্রেট। আই থট অ্যাজ মাচ। তুই শালা, গরু-ছাগলের চেয়েও ইনফিরিয়র। ফর ইওর ইনফরমেশান, তোকে বলি পচা, আমিও করিনি। দো আই অ্যাম ম্যারেড অলমোস্ট টুয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স।

তিন বছর পরের আঠাশে জুন আমাদের বিয়ের একুশ বছর হবে।

আমি বললাম, স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গেও...

হাঃ।

বলেই, এক ঢোকে অনেকখানি নিট হুইস্কি খেয়ে ফেলল গদাই।

আমারও সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

বললাম, আমাকে একটু দে তো।

কী?

আত্মবিস্মৃত হয়ে বলল, গদাই।

হুইস্কি।

উল্লসিত, উল্লম্ফিত হয়ে ও চেঁচিয়ে উঠে বলল, ও-ও-ও পচা। দ্যাটস লাইক আ রিয়্যাল গুড প্যাল, অ্যান ওল্ড প্যাল।

বলেই, ট্রলির তলাতে সাজিয়ে-রাখা একটি গেলাস তুলে নিয়ে

হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল, কমন নেশা, একটা কমন নেশা না থাকলে কোনও কম্পানিই কম্পানি নয়, সে নেশা নস্যিই হোক, পানই হোক, হুইস্কিই হোক, বিঠোভেনই হোক, কী ভীমসেন যোশী। অথবা একই নারী।

বলেই, আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমার বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এল।

গদাই বলল, বন্ধুত্ব বা দাম্পত্য বাঁচিয়ে রাখতে কিছু কিছু ডিপ-রুটেড সিমিলারিটির প্রয়োজন : সাম কমোন বন্ডেজ।

ওর ইংরেজি শুনে অবাক হয়ে বললাম আমি, বাংলাতে তো খেউড় করছিলি এসেই, ঝাবুর শ্বশুরবাড়িতেও তাই ; অথচ তুই বাংলা ইংরেজি দুই-ই তো বেশ ভালই জানিস দেখছি। আমার চেয়ে অনেকই ভাল। শিখলি কোথায় ?

হাঃ। ছাড়। শিখলাম কোথায় ? না, কোনও স্কুল-কলেজে শিখিনি। জীবনের পাঠশালা থেকে শিখেছি। ফ্রেঞ্চ এবং জার্মানটাও শিখেছি তবে কাজ চালানোর মতোই। ব্যবসার জন্যেই শিখতে হয়েছে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষে যা শেখে তা পৃথিবীর কোনও স্কুল কলেজই শেখাতে পারেনি, পারবে না কোনওদিন। বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যেরও আমি একজন মনোযোগী পাঠক।

বলেই বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না তো ! কলকাতাতে আমার বাড়িতে আসিস। ঝাবুর শ্বশুরবাড়ির মতো দেখানোর জন্যে লাইব্রেরি করিনি আমি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি, লাইব্রেরিতেই থাকি।

হাসিকে সঙ্গ দিস না ?

না।

কেন ?

আমার সঙ্গ যে তার পছন্দ নয়। গুটলুটা যে আমার কী উপকার করেছে তোকে খুঁজে এনে দিয়ে কী বলব মাইরি পচা। তুই শালা গত বাইশটা বছর কাবাব মে হাড্ডি হয়েছিলি। শালা যতই খুঁজি, যতই খুঁজি, যতই খুঁজি, হাড্ডি আর খুঁজে পাই না। এত্তোদিনে পেলাম।

কী করবি এখন ? মারবি না বেড়াল। যে বেড়াল শাদীর প্রথম রাতে মারা হয়নি।

দুসস শালা ! এখন হাড্ডিকে ইনস্টল করে দিয়ে কাবাবই গায়েব হয়ে যাবে। আমাদের রোটারিতে যেমন "ইনস্টলেশান সেরিমনি" হয় না, তেমনই তোর ইনস্টলেশান সেরিমনির জন্যেই তো এলাম

গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে। তোরা দুজনেই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ।

"ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি, রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি।"

বাবাঃ, তুই রবীন্দ্রসঙ্গীতও অনেক জানিস দেখছি।

কেন? স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাতে ফেল করেছিলাম বলে কি আনন্দযজ্ঞে যোগ দেবার অধিকার আমার নেই? জগতের আনন্দযজ্ঞে আমারও তো নিমন্ত্রণ ছিল। একটু বেশি দেরি করে পৌঁছলাম, এই যা।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়েছিলাম গদাই-এর দিকে। এত বড় ধাঁধাঁর মধ্যে আমার জীবনে আমি কখনওই পড়িনি।

গদাই গেলাসটা ভরে আমাকে দিয়ে বলল, চিয়ার্স। গড ব্লেস উ্য।

তারপর বলল, ভাবছি আমি তোর সঙ্গেই শোবো রে পচা। আপত্তি আছে? আমি হোমো নই। তোর সঙ্গে এক খাটে শোবো, অনেকদিন পরে। সেই হাকিমপুরে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে রাতে আমি আর তুই এক ঘরে শুয়েছিলাম, এক তক্তপোশে; মনে আছে? উরিঃ ফাদার। কী মশা ছিল রে! মনে আছে? আধ-পেটা খাওয়ালো, আর একটা মশারিও দেয়নি শালারা।

আমি হেসে উঠলাম গদাই-এর কথাতে।

বললাম, তোর মতো গোলকিপার কিন্তু বেশি হয়নি। খেলাটা রাখলে পারতি।

শালা, পরিবারের গোল-কিপিং করতে গিয়েই জান কয়লা হয়ে গেল, আর ফুটবলের গোলকিপিং।

কিছু কথা তোর মনেও আছে গদাই! সত্যি!

আমি মুগ্ধ গলায় বললাম।

মনে থাকে, মনে থাকে। এক অষ্টমীর রাতে হাসি তোকে শিউলিফুলের ভাল নাম জিজ্ঞেস করেছিল না কৃষ্ণনগরে? পুজো দেখে ফেরার পথে? তুই একটা তসরের পাঞ্জাবি পরেছিলি, আর শান্তিপুরী ধুতি। তখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিস সবে।

বল, ঠিক বলছি কি না!

আমার ভয় করতে লাগল।

বললাম, তুই জানলি কি করে?

আমার গোয়েন্দা আছে যে সব জায়গাতে। প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ী এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টেরই গোয়েন্দা থাকে।

আমি বললাম, গোয়েন্দা তোর এখন থাকতে পারে তখন তো আর ছিল না।

গদাই হাসল।

বলল, সেই রাতে তোদের সঙ্গে যারা ছিল, অষ্টমীর চাঁদের আলোতে-ছায়াতে, পুজোর আরতির বাদ্যি শুনতে শুনতে যাদের সঙ্গে হেঁটে আসছিলি তুই, তাদেরই মধ্যে কেউ বলেছে হয়তো। মনে কর, হাসিই বলেছে।

হাসি বলতেই পারে না।

কেন? পারবে না কেন? শিউলিফুলের ভাল নাম জিজ্ঞেস করাটাও কি ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য?

আমাব সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। কী যে সব ঘটছে আজ সকাল থেকে জানি না। হাসি, গদাই এরা সবাই জ্যান্ত মানুষ তো! ভূত-পেত্নি নয় তো!

হঠাৎই গদাই বলল, দুসস্। জমছে না। চানটা করেই আসি।

বলেই, রিমোট কন্ট্রোল বেলটা টিপল। বেলটা ট্রলির উপরেই ছিল। কর্ডলেস বেল।

রতন এল।

বলল, সায়েব।

এই যে শ্যামসুন্দর। একটা তোয়ালে দাও তো বাবা। আর সাবান। এই বাথরুমে। আমি চান করব। এঁর তোয়ালে, সাবান সব দিয়েছ তো?

হ্যাঁ, সায়েব। বাবুরটা তো সকালেই দিয়েছি। বাথরুম স্লিপারও।

বাবু নয় গজেন, সায়েব। এক কথা আমি দুবার বলি না। বলা পছন্দ করি না। বুঝেছো? আর বাথরুমের গীজার চালানো আছে কি?

হ্যাঁ সায়েব। অটোম্যাটিক তো। গরম জল আছে।

চান করার আগে নিজের ছোট্ট ওভারনাইটার না কি বলে, সেই ছোট্ট ব্যাগটি খুলে লুঙি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি বের করে নিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই চান সেরে ফিরে এসে আর একটা হুইস্কি ঢালল।

তুই এত বড় সায়েব আর লুঙি পরিস কেমন?

দূর শালা। সায়েব তো কর্মচারী আর কাস্টমারদের কাছে, ইমপোর্টারদের কাছে। নিজের বাড়িতে আমি পুরোপুরি ভেতো

বাঙালি।

সত্যি ! মুখ একটা করেছিস বটে। মুখ তো নয়, যেন নর্দমা।

আমি বললাম।

আরে এই মুখ দিয়েই তো বাইরের জগৎটাকে দূরে রাখি। সব সময়ে সকলের মধ্যে ভয় জাগিয়ে রাখতে হয়। রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" পড়িসনি কি ? আমার অন্তজর্গতে বড় শালীনতা, সুরুচি। আমার সুরুচিটা তোর গার্লফ্রেন্ড হাসির মতো লোক-দেখানো নয়। যা যত গভীর, তা ততই নিথর। আমার সংস্কৃতি গভীর বলেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বা খলসে মাছের মতো তিড়িং-বিড়িং করে তা প্রমাণ করতে হয় না ন্যাকার মতো।

ন্যাকা কী করল আবার ?

কী করল না বল ? মেয়েটা তো ওর ভাইস-চ্যান্সেলরের।

কার মেয়ে ?

আরে ওদের কন্যা। এদিকে শালা আবার বাম-রাজনীতি করে।

ডান রাজনীতি করলে কি দোষের হত না ?

আমি বললাম।

হেসে ফেলল, গদাই।

তারপর বলল, আঁতেল ! আগেকার দিনে কলকাতার বেনেরা সাহেবদের কাছে পালকি করে বউ পাঠাত বলে কত ছিঃ ছিঃ। আরে তারা তো পয়সা কামানোর জন্যেই করত। কোনও প্রিটেনশান ছিল না। কিন্তু এই আঁতেল চূড়ামণিরা ?

তারপরই বলল, যাই বলিস, আমরা এক কেলাসে কিছু মাল পড়তাম বটে। গুটলুর ক্যালি আছে মাইরি ! কী করে যে সব একজায়গায় জড়ো করল। আমি ভাবছিলাম, গুটলু খুব ভুল করেছে। যা হয় না, তা হয় না। এত বছর পরে...

রিইউনিয়ন শব্দটাই একটা মিসনোমার।

তারপর বলল, এই যে তোদের "হিরো", "ডাক্তারদা" সবুজবাবু, ব্যাচেলর, সেদিন আমাদের কাছে বহুত বক্তৃতা মেরে গেল। সাধু না কি হয়েছে ! আসলে শালা ঝৈন ?

কী !

ঝৈন। স্ত্রী-ভক্তদের যদি স্ত্রৈণ বলো তো, ঝি-ভক্তদের ঝৈন বলবে না ?

হতবাক হয়ে গেলাম গদাই-এর শব্দতত্ত্ব শুনে।

যে-মেয়েটা ওকে রান্না-বান্না করে দেয়, তাকেই রাতে সুগন্ধি সাবান

দিয়ে চান করিয়ে, পাউডার মাখিয়ে, নাইটি পরিয়ে পরম কম্মো করে।

তুই কি সবই জানিস গদাই ? পৃথিবীতে একজন মানুষ, আমাদের ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে একজনও কি পিওর নেই ? ভাল নেই ? পবিত্র ? রিয়্যালি ভাল ?

হাঃ।

তুই ঝাবুর বাড়ি যাবার আগেই প্রত্যেকের সম্বন্ধে এত সব খোঁজখবর নিয়ে এলি কি করে !

ব্যবসা করতে হলে একটা নেটওয়ার্ক গড়ে নিতে হয়ই। নইলে কোনও ব্যবসাই করা যায় না। যে-কোনও খবরের কাগজ, যে-কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস এক একটি স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ড।

তারপর বলল, তুই হাসালি পচা আমাকে ! পবিত্র ! মাই ফুট ! আজকাল পবিত্র কোনও জিরাফই নেই, তার মানুষ।

হঠাৎ জিরাফের কথা কেন ?

আমরা জিরাফেও আছি ধর্মেও আছি, তাই। শালা, একটা অরিজিন্যাল কবি টেঁসে গেল মাইরি !

একটু চুপ করে থেকে বলল, সব শালা দু' নম্বরী। আমাদের এই ক্যালিওয়ালা গুটলুচন্দ্র ব্যাচেলর—তারও তো তার বউদির সঙ্গে অ্যাফেয়ার। ওর ন'দাদাটাও হাবাগবা। ছেলেটাও ওরই।

আমি দু' কানে আঙুল দিয়ে বললাম, আমি আর শুনতে চাই না কিছু। তুই একটা পারভার্ট, সিনিক। আমার সুন্দর ছেলেবেলাটাকেই কদর্য করে দিলি তুই।

তুই যাই বল পচা, পৃথিবীটা এখন এইরকমই হয়ে গেছে।

আমার সম্বন্ধে তদন্ত করে আর কী বের করেছিস ?

বলব, বৎস সব বলব। শনৈঃ শনৈঃ। তুইও কিছু ধোওয়া তুলসী পাতা নোস।

এমন সময় দরজার কাছে শাড়ির খসস খসস শোনা গেল।

হাসি বলল, আসব ?

গদাই বলল, তোমারই তো বাড়ি। জিজ্ঞেস করছ কাকে ?

তুমি তো একা নেই।

দ্যাটস রাইট। পচা আছে। পরপুরুষ ! কিন্তু পচাও কি তোমার পর ?

সে প্রসঙ্গ থাক। তুমি কি সত্যিই কিছু খাবে না রাতে ? আর এ ঘরেই কি শোবে ?

হ্যাঁ। ন্যাংটোপোঁদের বন্ধু পচার সঙ্গে আজ সারারাত গপ্পো করব। কাল আমি শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসেই চলে যাব কিন্তু। দুপুরে পাঁঠার মাংস করতে বোলো তো দই দিয়ে! তোমার প্রকাশ কি পারবে? না পারলে বোলো, আমি নিজেই রাঁধব, লুঙি কষে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, শান্তিনিকেতন জায়গাটা বুদ্ধিমান ইন্টেলেকচুয়ালদের ঘাঁটি হলেও এখানকার পাঁঠারাও কিন্তু কম যায় না। কচি। সুস্বাদু। হাড় পর্যন্ত কচকচিয়ে খাওয়া যায়। রূপে-গুণে একেবারে কালিঘাটের বাঙালি-পাঁঠা।

তাই?

আমি বললাম।

মাংস কী দিয়ে খাবে? ভাত করতে বলব, না পোলাউ?

হাসি জিজ্ঞেস করল।

হাসির কথার উত্তর না দিয়ে, গদাই আমার দিকে ফিরে বলল, তুই মিষ্টি পোলাউ খেতে ভালবাসিস পচা? ছেলেবেলায় প্রত্যেক বাঙালি-বাড়িতেই যে পোলাউ রান্না হত? কিসমিস, পেস্তা, গরম মশলা দিয়ে যে বাসমতি চালের পোলাউ, লালচে-লালচে; খাবি? এখন তো সব বাড়িতেই চাইনিজ ফ্রায়েড রাইস রান্না হয়। রিয়্যাল চীনারা এই কুখাদ্য খেলে বমি করে করেই মারা যেত। সত্যি! আমাদের মতো নকল-নবিশ জাত আর হয় না! কলকাতাতে পাটিসাপটা, পুলিপিঠে কী চন্দ্রপুলি কী ফুলকপির সিঙাড়া কী কড়াইশুঁটির চপ, কী ঢাকাই পরোটা (ছোলার ডাল দিয়ে, আহা!) কি একটা দোকানেও পাওয়া যায়? বল তুই! মুসলমানী পাকানো রোল, চিকেন, মাটন অথবা এগ; আগে শুধুমাত্র নিজামে বা সেন্ট্রাল ক্যালকাটার অন্য মুসলমানী খাবারের দোকানেই যা পাওয়া যেত; তামিলনাড়ুর, অন্ধ্রর, কেরালার আর কর্ণাটকের দোসা-ইডলি-উত্থাপম, পাঞ্জাব-হরিয়ানা-দিল্লির চানা-বাটোরা, উত্তর ভারতীয়, মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাঁব বা রেজালা—রুমালি রোটি, শিক কাবাব এইই সব। আরে শালা নিজেদের খাদ্যর মধ্যে ভাল কি কিছুই ছিল না? চিঁড়ের পোলাউ, ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, গাজর, আলু, পটল অথবা চিনা বাদাম দিয়ে? সুজির খিচুড়ি? সাবুর খিচুড়ি, ভুনি খিচুড়ি। এ-সবের স্বাদ তো অবাঙালিরা জানেই না সম্ভবত। অথচ খেতে পেলে, আহা! আহা! করত!

হাসি বলল, শেষ হয়েছে? ফিরিস্তি?

তারপরে আমার দিকে ফিরে বলল, এমন এপিকিউরিয়ান লোক

আপনি দেখেছেন আগে অবুদা ?

গদাই বলল, মানুষে ফ্রাস্টেটেড হলে বেশি খায়, বেশি ড্রিঙ্ক করে।

তোর আবার কিসের ফ্রাস্টেশন ?

আমি বললাম।

হাসি এবার চোখ তুলে চাইল গদাই-এর দিকে। নিমেষের জন্যে।

বুঝলাম না কেন ?

কার ফ্রাস্টেশন কিসের জন্যে তা কি অন্যে বুঝতে পারেরে পচা, বল ? তা ছাড়া, সাকসেসও অনেক সময়ে মানুষকে ফ্রাস্ট্রেটেড করে। শুধু কি ফেইলিওরই করে ?

হয়তো করে।

আমি বললাম।

আমরা অসফল মানুষ, তাই হয়তো ফ্রাস্টেশনের নেতিবাচক কারণটাকেই একমাত্র কারণ বলে জানি।

হাসি, কথা কেটে বলল, রাতে সত্যিই কিছুই খাবে না ? একটা ওমলেট করে দিতে বলব ? এবারে বাইরে গিয়ে কি ডিম খেয়েছিলে ? এ সপ্তাহে ক'টা খেয়েছিলে ?

অত হিসেব রাখা যায় না। নিজে ডিম পাড়লেও নিজের ডিমের হিসেব রাখতে পারতাম না আমি, তার মুরগির ডিম।

বলো, করে দিতে একটা, দু-ডিমের। ও জানে তো আমি কেমন পছন্দ করি ?

গদাই বলল, হাসিকে।

আমি বলে দেব।

হাসি বলল।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, তাহলে গুডনাইট অবুদা।

বেচ্চারি! আমি এসে পড়ে রসভঙ্গ করলাম।

গদাই বলল হাসিকে।

তারপর বলল, আরে আজকে আমি আছি তাই আজকে শুধুই গুডনাইট। আগামী কাল বেটার নাইট। আর পরশুদিন বেস্ট নাইট। কয়েক মেগাটন মেঘ আমি কমিশান করে পাঠিয়ে দেব বীরভূমে যাতে কাল পরশু সারারাত অঝোরে বৃষ্টি পড়ে। রাতে হাসি গাইবে তার অবুদার জন্যে পরশু : "আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে/যে কথা শুনায়েছি বারে বারে/আমার পরাণে আজি যে

বাণী উঠিছে বাজি অবিরাম বর্ষণধারে।”

হাসির চোখে-মুখে এক মিশ্র অনুভূতি ফুটে উঠল : সুখ এবং দুঃখের। পরক্ষণেই লজ্জার রঙ ছড়াল মুখময়।

বলল, আরম্ভ হল আবার। তুমি যে নিজেকে কী ভাঁড়ই সাজাতে পারো!

আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো ভাঁড়ের দুঃখের কথা। তাদের দুঃখের কথা কম মানুষেই জানে!

এই তো করলে সারাজীবন! তোমার যে কতরকম রূপ তা যদি নিজে দেখতে পেতে। বহুরূপীও লজ্জা পাবে তোমাকে দেখে।

তাও, কেউ তো পাবে। তুমি লজ্জা পাও পচার প্রসঙ্গে আর বহুরূপী পাবে আমার প্রসঙ্গে। যার যেমন কপাল।

চললাম আমি। রতনকে দিয়ে জলের জাগ আর গেলাস পাঠিয়ে দিচ্ছি। মশারি গুঁজতে কি পাঠাব? না এ.সি. চালিয়ে শোবে?

না না। এখানে এ.সি. চালালে পাখির ডাক শোনা যায় না, ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় না, শোনা যায় না বৃষ্টির আওয়াজ; পাশের বাড়ির ডবকা বউ-এর গান। এ.সি.-ফে.সি নোংরা, কুটিল কলকাতারই জন্যে।

হাসি চলে গেলে, গদাই বলল, কী রে! খা। খাচ্ছিস না যে তোর হুইস্কি?

এতেই মনে হচ্ছে ধরে গেছে।

আমি বললাম।

ফুঃ। গ্লেনফিডিশ হুইস্কির বোতল দু' বন্ধুতে বসে গল্প করতে করতে শেষ করে দেওয়া যায় বোঝার আগেই। ভাল হুইস্কি, তোর মতো ভাল সঙ্গীর সঙ্গেই খেতে হয়। অথচ তুই এমন বেরসিক!

এ-সব বড়লোকদের জন্যে। গরিবের ঘোড়া রোগ বাঁধিয়ে...

হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে গদাই বলল, আমার এখানে এই হঠাৎ আগমনে তোর মনে কিছু আসেনিরে পচা?

চুপ করে একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, মিথ্যে বলব না। এসেছিল।

কী?

সেটাই এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না।

কেন?

পারছি না!

তোর সঙ্গে যেদিন কথা হল ফোনে শেষবার স্টেটস-এ যাবার

আগে তখনই কি তোদের শান্তিনিকেতনে আসাটা ঠিক ছিল ?

গদাই জিজ্ঞেস করল আমাকে।

সত্যি বলব ?

মিথ্যে বলবি কেন ? তুই তো মিথ্যেবাদী নোস।

ছিল।

আমাকে বলিসিনি কেন ?

ঠিক জানি না। হয়তো কিছুটা ভয়ে, কিছুটা লজ্জায় ; কিছুটা হাসির কথা ভেবে। ভেবেছিলাম, বলার হলে, হাসিই বলবে। নিয়ে তো সে-ই আসছে আমাকে। আমি তো আর তাকে নিয়ে আসিনি। সে সামর্থ্যই বা কোথায় আমার !

কথা ক'টি বলতে বলতে, লজ্জাতে আমি মুখ নামিয়ে নিলাম।

সিলি ! টিপিক্যাল মিডল-ক্লাস মেন্টালিটি ! পশ্চিমের কোনও দেশ হলে তোর মতো দামড়ার মুখে এমন লজ্জা দেখে লোকে তোকে পাগল অথবা ন্যাকাচুড়ো ভাবত। দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ, ছেলেবেলায়, শুধু ছেলেবেলায়ই-বা কেন, কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনেও যাদের মধ্যে মিষ্টি এবং গভীর এক সম্পর্ক ছিল, যদিও মানসিক ; তারা দু'জনে যদি তাদেরই একজনের কলকাতার বাইরের বাড়িতে বেড়াতে আসে তাতে লজ্জা বা অপরাধবোধের কী থাকতে পারে ? কী জানি ! মাঝে মাঝে মনে হয়, শুধু তোরাই নোস, এই শালার বাঙালি জাতটাই কোনওদিনও অ্যাডাল্ট হবে না, ন্যাকা-বোকা কিশোর-কিশোরীই থেকে যাবে।

তারপরে গদাই বলল, যদি কোনও হোটেলে গিয়ে উঠতি, তাতে আমার স্ত্রীর বদনাম হতে পারতো, আমারও অপমান, কিন্তু তোর বদনাম তো হতো না !

আবারও একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু তোরা তো এসেছিস শান্তিনিকেতনেই। হাসির নিজের বাড়িতে। শিউলিফুলের ভাল নামটা ভুলে গেছিস, সেই নামটিকেই মনে করতে। এও তো এক ফুলগন্ধী ব্যাপার। আ ভয়েজ ফর ফাইন্ডিং দ্যা ফরগটেন নেম অফ আ ফ্লাওয়ার। হাউ রোম্যান্টিক ! হাউ সুইট। তুই তো আর "টানা মাল" সঙ্গে নিয়ে অপকম্মো করতে আসিসনি !

আমি মুখ নামিয়ে বসে রইলাম।

সত্যি ! গদাইকে নিয়ে চলে না। ও ক্রমশই আমার কছে একটা পাজল হয়ে উঠছে। বিরাট এক ধাঁধাঁ।

পরক্ষণেই গদাই বলল, আমি কিন্তু জানতাম।

কী জানতিস ?

তোরা যে আসবি ।

কী করে ?

জানতাম। ইনটিউশানে। সিকসথ সেন্স-এ। এবং জানতাম বলেই জনস্টনদের পরের সপ্তাহে আসতে বলে এখানে চলে এলাম।

এলি কি আমাদের নিষ্পাপ আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে ? স্যাডিস্ট মনোবৃত্তি নিয়ে ?

না রে হাঁদারাম। শিউলিকে প্রস্ফুটিত করতে এলাম। তা ছাড়া, অ্যাপারেন্টলি যা কিছুকেই ইনোসেন্ট বলে মনে হয়, তার অধিকাংশই কিন্তু ইনোসেন্ট নয়। সমস্ত সাংঘাতিক বিপজ্জনক সম্পর্কেরই সূচনা হয় কোনও ফুলগন্ধী ইনোসেন্স দিয়েই।

তাই ?

হ্যাঁরে।

তুই কি বলবি, স্পষ্ট করে বল গদাই। আমি কি চলে যাব শান্তিনিকেতন থেকে ? নাকি, তুই আমাকে খুন করতে চাস ? আমি কিন্তু কোনও অন্যায় করিনি। করব না।

গলা নামিয়ে গদাই বলল, না রে! আমি খুব খুশি হয়েছি তোরা এসেছিস বলে। আমাকে তোর সাহায্য করতে হবে পচা। জীবনে সমস্ত যুদ্ধ জয় করেও জয়ী হতে পারলাম না রে, মর্মান্তিকভাবে হেরে গেলাম ; হেরে রইলাম সারাটা জীবন।

কী সব বলছিস তুই ?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

ঠিকই বলছি। আই হ্যাভ ওয়ান অল দ্যা ব্যাটলস অফ মাই লাইফ বাট লস্ট দ্যা ওয়ার। ইয়েস। মিজারেবলি।

বলেই বলল, তুই ভোরে কখন উঠিস ?

সকালেই।

সকালে তো অবশ্যই। কিন্তু কখন ?

গদাই-এর চরিত্রের এই একজাক্টনেসটা আমাকে ক্রমশই মুগ্ধ করছিল। যাঁরা জীবনে সাকসেসফুল হন, তাঁদের সকলের মধ্যেই সম্ভবত এই গুণটি থাকে।

এই, পাঁচটা নাগাদ উঠি।

ঠিক আছে। আজ তা'হলে এ পর্যন্তই থাক। ভোরে উঠে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়েই তোকে পথেই বলব কথাটা। কী করে বলব জানি না, তুই কীভাবে নিবি তাও জানি না। কিন্তু বলব। তোকে আমার,

Confessional করব।

হাসি বলেছিল, সকালে গোয়ালপাড়ার দিকে আমাকে হাঁটতে নিয়ে যাবে কাল ভোরে।

আমি বললাম।

গোয়ালপাড়ায়।

বলেই, হাসল হাঃ হাঃ করে।

বলল, তোর প্রজাতির রকম সম্বন্ধে হাসির ধারণা যে অত্যন্তই স্পষ্ট এটা জেনে হাসির উপরে ভক্তি বেড়ে গেল আমার। তা গোয়ালপাড়াতে যাবি'খন। হাসি আর তুই তো থাকবিই। আমিই তো চলে যাব। গরু, ষাঁড়, বাছুর, এই সব তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। গোয়ালপাড়াতেই থাকবে। যদিও আমি জানি না, গোয়ালপাড়াতে এখন ননীচোরেরা থাকে কি না।

একটা কথা বলব ?

খুবই সংকোচের সঙ্গে বললাম আমি।

বলল, একটা কেন, দশটা বল।

তোর সঙ্গে হাসির সম্পর্কটা ঠিক কেমন বল তো ?

যেমন দেখছিস, তেমনই। এর আবার ঠিক-বেঠিক কী ?

সেদিন ঝাবুদের বাড়িতে অমন করে সকলের সামনে ওকে অপমান করলি কেন ? সেই ঘটনাটা, আমার চোখে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

আমার স্বভাবটাই চাষার মতো। ও কিছু মনে করে না। ও আমাকে চেনে। নিধুবাবুর না কার যেন একটা পুরাতনী গান আছে না ? সেই, "ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে" আমিও তেমনই খারাপ ব্যবহার করব বলে খারাপ ব্যবহার করি না। আমার স্বভাবটাই ওরকম। বস্তিতে তো থাকতাম। তুই তো সবই জানিস। তবে বস্তিতে থাকতাম, তাই যারা শুধু টাকা আছে বলেই আমাদের জানোয়ারের মতো ট্রিট করত, সেই সব মানুষগুলোকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই ব্যবসা করতে নেমেছিলাম রে পচা। "ক্যাপিটাল না থাকলে ব্যবসা হয় না" এই যে বাঙালিদের চিরাচরিত ফালতু অজুহাত এটা যে মিথ্যে তা আমি প্রমাণ করে দিয়েছি। জীবনে জেদ থাকলে, সবই হয়। আসল হচ্ছে, বুদ্ধি, ব্যবহার, খাটবার ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং সততা।

সততা ! সততা নিয়ে আজকাল ব্যবসা হয় ?

আমি বললাম, অবিশ্বাসীর গলাতে।

হয় রে পচা, হয়। বোসিক সততা না থাকলে কেউই বড় ব্যবসায়ী বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারে না। সব অন্তঃসারশূন্য রটনা, অপদার্থ ঈর্ষাকাতরদের রটনা। বড়লোকমাত্রই চোর, চুরি না করলে টাকা হয় না, এ-সব একেবারেই মিথ্যে কথা, গা-জোয়ারি কথা। তবে এটা ঠিক যে, বড় ব্যবসাতে নানান প্রতিবন্ধকতা আসেই। চোর-ছ্যাঁচোরদের, ঘুষখোরদের, দাদাদের, নেতাদের খপ্পরে পড়তে হয়ই। তবে সেসব আমি আমার কর্মচারীদের দিয়েই ট্যাকল করাই। মাস্তান, দাদা, নেতা, সকলেই এ-কথা জানে যে, আমি অন্য ধাতুর লোক।

যাক, ব্যবসার কথা থাক। আমি ব্যবসার কীই-বা বুঝি। কাল থেকেই আমি শুধু ভাবছিলাম, তোর আর হাসির জীবনে কিছুরই অভাব নেই। শুধু একটি সন্তান যদি থাকত! আর এখনও তো সময় আছে।

কিসের?

হাসির মা হওয়ার অনেকই সময় আছে।

দোষটাতো হাসির নয়। আমারই দোষ।

এতে দোষের কী আছে?

আরে স্পার্ম-এর গোলমালের কথা বলছি না। Artificial Insemination-এ ও রাজি নয়। তাই ওই প্রসঙ্গই অবান্তর। আমি... মানে কী বলব, কেমন করে বলব তোকে পচা, তোকে বলেই বলতে পারলাম, এর আগে কারওকেই বলিনি, সত্যি একজনকেও নয়। আমি আসলে করতেই পারি না। আমি, যাকে বলে...বুঝলি!

আমি গদাই-এর সারল্যে এবং দুঃখে অভিভূত হয়ে গেলাম। কিছুই বলতে পারলাম না।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, মানুষ তো ষাঁড় নয় যে, ওই কম্মোটি করতে না পারলেই তার জীবন বিফল হয়ে গেল! কত কী তো করার আছে দু'জন মানুষের জীবনে। শরীর ছাড়াও, সন্তান ছাড়াও দাম্পত্য সুন্দর হতে পারে। আমি তো ব্যাচেলর। আমিও তো শরীর ছাড়াই বেঁচে এলাম বাহান্ন বছর। অবশ্য আমার জীবনে শারীরিক সম্পর্কের কোনও সুযোগই আসেনি।

ও বলল, অন্য যে-কোনও মেয়ে হলে ডিভোর্স চাইত। আর আমার স্ত্রী ডিভোর্স চাইলে সে কি না পেত বল? বাড়ি, গাড়ি, টাকা। তারপর ডিভোর্স নিয়ে হয়তো তোকে বিয়ে করত।

হাসলাম আমি।

বললাম, আমাকে তো তুইই আবিষ্কার করলি এই মাত্র ক'দিন

আগে। আমি তো হারিয়েই গেছিলাম। তা ছাড়া, ডিভোর্স তো আজকাল ঘরে ঘরেই হচ্ছে। তাতে বিন্দুমাত্র এমবারাসমেন্টেরই কারণ তো নেই। দিলেই পারতি। তুই তো নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। তুই তো সাধারণ মানুষ নোস। তোর বউ থাকল কী না থাকল তাতে কীই-বা এসে গেল। আমার মতো পচা কেরানিরই যখন বউ-এর পরোয়া নেই।

সেকথা নয় রে। বড় অপরাধী লাগে। আমার এই লজ্জা, হাসি সারাজীবন সকলেরই কাছে লুকিয়ে বেড়াল। আমার জন্যে ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। ও ফুল, গাছপালা এত ভালবাসে অথচ নিজের জীবনেই একটিও ফুল ফোটাতে পারল না। সেই দোষ তো ওর নয়, দোষ তো সব আমারই। অথচ কোনওদিনও অনুযোগ করেনি। একটি কথাও বলেনি মুখ ফুটে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার এমন অপরাধী লাগে যে, কী বলব ! মনে হয়, আত্মহত্যা করি।

ভীষণ কষ্ট হল আমার গদাইকে দেখে।

বললাম, সে কী রে !

ও বলল, তোকে বলি, এই তো যেদিন স্টেটস-এ গেলাম, লানডান হয়ে। কলকাতা থেকেই তো যাওয়া যায় এখন। সন্ধেবেলা ফ্লাইট। রবিবার ছিল। দুপুরে ভাল করে ভাত খেয়ে একটা ঘুম লাগিয়ে যখন উঠলাম তখন বেশ দেরিই হয়ে গেছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দাতে এসেই দেখি হাসি বারান্দার গ্রিলের উপরে দুটি হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে পথের দিকে চেয়ে। কী যেন দেখছে মনোযোগের সঙ্গে। তুই তো দেখেছিস সল্ট লেক-এ আমাদের বাড়ি যেখানে, সেখানে এখনও অনেক ফাঁকা জায়গা আছে। শরতে কাশফুল ফোটে। বর্ষার শোভা ভারী সুন্দর। লোকজন এখনও কমই। দেখি, পথ দিয়ে একটি অল্পবয়সী বউ হেঁটে যাচ্ছে তার বাচ্চার হাত ধরে। মায়ের পরনে লাল সালোয়ার-কামিজ আর ছোট মেয়েটির পরনে লাল ফ্রক। পরিপাটি করে সাদা মোজা, লাল জুতো পরিয়েছে বাচ্চা মেয়েটাকে তরুণী মা। চোখে কাজল। তেল-চকচকে, আঁচড়ানো মাথাতে লাল-রিবন বেঁধে দিয়েছে। তার কন্যার হাতে হাত রেখে হেঁটে-যাওয়া সেই কচি মায়ের মুখে এমন এক গর্ব-গর্ব ভাব দেখলাম, জানিস ; মাতৃত্বর গর্ব, যে বুকটা হু হু করে উঠল নিজে নারী না হয়েও।

হাসি একদৃষ্টে মা ও মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না পথের মোড়ে বাঁক নিয়ে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর ?

আমি হুইস্কির গেলাসটা শেষ করে ফেললাম। অজানিতেই।

গদাই, তা দেখেও তখুনি আবার নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। অন্যমনস্ক গলাতে ও বলল, আমি পেছনে গিয়ে হাসির দু' কাঁধে দু'হাত রাখলাম। ও চমকে উঠে মুখ ফিরাল। আর মুখ ফিরিয়েই আমার বুকে মুখ নামাল। দেখলাম, ওর দু'চোখ জলে ভরা।

আমি চুপ করে রইলাম।

এবারে গদাই আমার গেলাস ভরে দিল বেশি জল আর অল্প হুইস্কি দিয়ে।

গদাই বলল, জানিস পচা, নিজের কারণে, মানে নিজের অপরাগতা বা অসাফল্যের কারণে, নিজের যা দুঃখ তা সহজেই সহ্য করা যায় কিন্তু নিজের অপারগতার কারণে অন্যের যে দুঃখ, তা লাঘব করার উপায় নিজের হাতে নেই বলেই নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করে। আমি নিজেকে বুঝি না রে। সব দোষ নিজের জেনেও বাইরের লোকেব সামনে হাসিকে বিনা কারণে অপমান করি। ও প্রতিবাদ করে না বলেই আরও অপমান করি। বোবাকে কথা বলাতে চাই। একেই বোধহয় sadism বলে। বুঝিনারে, নিজেকে সত্যিই বুঝি না।

তারপর নিজের গেলাসে বড় করে একটা হুইস্কি ঢেলে গদাই বলল, তোর কাছে একটা ভিক্ষা চাইব রে পচা। কথা দে, যে নিরাশ করবি না।

আমার অন্তরাত্মা ভয়ে এবং উত্তেজনাতেও কেঁপে উঠল।

তুতলে বললাম, ক-কি ? কী ভিক্ষা ?

তুই হাসিকে একটি সন্তান দে। প্লিজ !

আমি সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। কী যেন কামড়াল আমায়। তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলাম। বললাম, আস্তে, আস্তে কথা বল। জীবনে এমন উদ্ভট কথা তো শুনিনি কোথাওই। কোনও গল্প-উপন্যাসেও পড়িনি। তুই আশ্চর্য মানুষ গদাই ! এ-সব কথার মানে হয় কোনও ! তোর মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গদাই অনেকক্ষণ আমার মুখে চেয়ে রইল। বলল, আই অ্যাম টকিং সেন্স।

তোর একার ইচ্ছেতেই কি সব হবে ?

আমি জানি বলেই বলছি। হবে, হবে। হবে। তা ছাড়া হাসির কোনওই আপত্তিই থাকবে না তোর বেলাতে। তা আমি জানি বলেই

তো তোরা যাতে এখানে আসিস তার সুযোগ করে দিয়েছিলাম ইচ্ছে করেই।

বলেই, ও আমার হাত চেপে ধরল ওর দু'হাতে।

বলল, পৃথিবীর আর কেউই জানবে না এই কথা। আমরা তিনজনে ছাড়া। জানবে না, সেই অনাগত সন্তানও। সে ছেলেই হোক কী মেয়ে। হাসি তো তোকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমার যখন তোদের মিলনে কোনও আপত্তি নেই, তোর কেন আপত্তি হবে ? আমরা দু'জনেই তো তোকে পছন্দ করি, ভালবাসি।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

এমন সময়ে রতন এসে দরজার ওপাশ থেকে বলল, সায়েব, মশারি কি টাঙিয়ে দেব ?

হ্যাঁ।

বলেই, গদাই গিয়ে আমার বন্ধ-করা দরজা খুলল।

তারপর বলল, পঞ্চানন, একতলারই আব একটা ঘর খুলে দে। আমি সেখানে শোব। সেখানে আগে মশারি টাঙিয়ে জলটল দিয়ে তারপর এ ঘরে আয়।

হ্যাঁ সায়েব।

মেমসায়েব কি শুয়ে পড়েছেন ?

না।

কী করছেন ?

বই পড়ছেন।

ঠিক আছে। মেমসাহেবকে কিছু বলার দরকার নেই।

আমি বললাম, শুবি না এ ঘরে ?

নাঃ।

কেন ? তুইই তো বললি যে, শুবি।

আমি বড হবার পর থেকে কাবও সঙ্গেই শুইনি এক ঘরে।

সে কী ! হাসির সঙ্গেও ! বলিস কী তুই। তোর সব কিছুই অদ্ভুত।

ছেলেবেলাতে নিরুপায়েই একাধিক মানুষেব সঙ্গে শুতাম। ছিল তো মাত্র দুটি ঘর, কুল্লে। তারপরে, বিয়ের পরে হাসির সঙ্গে এক ঘরে শুতাম, লোক দেখানোর জন্যে। তারপরে আলাদা হয়ে আসার পর থেকেই আলাদা ঘরে শুতাম। এত বছর একা শুয়ে শুয়ে অন্য কারও সঙ্গেই আর শুতে পারি না।

একা ঘরে শুতিস কেন ?

তুই বিবাহিত হলে বুঝতে পারতিস। তোকে বোঝানো মুশকিল। অনেক চালু অবিবাহিতরাও অবশ্য এ-কথা বুঝবে! যাদেরই শরীরী অভিজ্ঞতা আছে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ছেলেবেলায় ঠাকুমা-দিদিমারা বলতেন না! ঘি আর আগুন একসঙ্গে রাখতে নেই। সেই রকমই নারী ও পুরুষ এক খাটে পাশাপাশি শুলেই, কিছুক্ষণ পরেই একটু ছোঁয়াতে। একটু দেখাতে, এর হাত ওর গায়ে বা পায়ে লাগাতে কাম জাগেই। যৌবনে তো বটেই, প্রৌঢ়ত্বেও। আমি না-হয় নপুংসক, কিন্তু হাসি তো স্বাভাবিক। ভারি কষ্ট পেত ও। আগুন জ্বালানো খুবই সোজা, আগুন নিবানো বড় কষ্ট। আমার নিজের কষ্ট তো আছেই, সে অন্যরকম কষ্ট। কিন্তু হাসির কষ্ট যাতে আরও না বাড়ে এই কনসিডারেশানেই শোবার সময়ে আলাদা শুতাম। তবে, আমাদের দু'জনের ঘরের মধ্যে কানেক্টিং ডোর আছে। আমার সব বাড়িতেই ছিল। গল্প-গুজব করা, গান-বাজনা শোনা, বই পড়া, এই সবের পর যে যার ঘরে গিয়ে শুই, শোবার সময়ে। একদিক দিয়ে এ হয়তো ভালই। যাঁরা অ্যাফোর্ড করতে পারেন, তাঁদের আলাদা ঘরেই শোওয়া উচিত নইলে দুজন মানুষের স্বভাব-চরিত্র একে অন্যের দ্বারা বড় বেশি প্রভাবিত হয়ে যায় বলেই আমার মনে হয়। তবে শুধু একসঙ্গে শোওয়ার জন্যেই যে হয়, সে কথা বলব না।

হাসি কোনওদিনও বিরক্তি দেখায়নি? তোকে ছেড়ে যেতে চায়নি?

না। ও বলত, এটা তো একটা অসুখ। তুমি কী করবে! আমরা তো পায়রা বা গরু বা ছাগল নই, আমরা মানুষ। মানুষের দাম্পত্যর সঙ্গে জানোয়ারের দাম্পত্যর তফাত আছে, থাকবে।

আশ্চর্য! এরকম মেয়ের কথা কস্মিনকালেও শুনিনি।

আমি বললাম।

চলি।

বলেই, হঠাৎ উঠল গদাই।

বলল, আর একটা খাবি না কি?

না, না। জীবনে কখনও...।

হয়তো নিজের কারণে লজ্জিত হল ও। আমাকে এসব কথা বলে ফেলে কি ওর অনুশোচনা হয়েছে?

॥ ১২ ॥

এখন গদাই আর হাসির শান্তিনিকেতনের বাড়ির প্রায় সব আলোই নিভে গেছে। গেটের দু' পাশের থামের উপরে দুটো গোল বাতি জ্বলছে। তারের জাল দিয়ে ঘেরা।

ভাবছিলাম, এমনই দেশ আমাদের যে, এখানে কোনওরকম সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিবোধ থাকাটাও পাপ। ছেলেবেলাতে, সাহেবদের আমলে তবু দেশে আইন-শৃঙ্খলা ছিল। খারাপ মানুষ, চোর-জোচ্চোরদের প্রাণে ভয়ডর ছিল। আজকে সকলেই স্বাধীন। স্বদেশেও কোথাওই নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে যাওয়ার উপায় নেই। স্বোপার্জিত পয়সাতেও নিজের বাড়িকে সুন্দর রাখার উপায় নেই। কখন কে ইট মারবে, কখন কে বালব চুরি করে নেবে। সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকা, কী শহরে, কী মফস্বলে ; কী গ্রামে। পুলিশ একটি শোভামাত্র। উপকারের চেয়ে অপকারেই সেই নির্লজ্জদের অধিকাংশেরই বেশি উৎসাহ। বর্তমান প্রজন্মের ভারতীয়দের মতো এমন অভিভাবকহীন "ভগবানের দয়াতে" বেঁচে থাকা মানুষ সম্ভবত পৃথিবীতে কমই আছে।

বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে। ভাগ্যিস এখনও ফুলের গন্ধ নির্বিঘ্নে আসে। মিশ্র গন্ধ। আমি তো সব ফুল চিনি না। উত্তর কলকাতাতেই তো গলির মধ্যে কাটিয়ে দিলাম সারাটা জীবন। কার গন্ধ কী রকম জানব কি করে ! কিন্তু ভারি ভাল লাগছে।

হাসির ঘরে হাসি। গদাই কোন ঘরে শুয়েছে কে জানে। আমি আমার ঘরে। এতক্ষণে হাসি সম্ভবত বই-পড়া শেষ করে ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। গদাই কি এখনও হুইস্কি খাচ্ছে ? কে জানে ! কী যেন নাম বলল হুইস্কিটার ? গ্লেনফিডিশ না কী যেন ! স্কটল্যান্ড তো ছোট্ট জায়গা। তাতে কতরকম হুইস্কি হয় কে জানে ! স্কটল্যান্ডের মানুষদের বলে "স্কটসম্যান" আর স্কটল্যান্ডের জিনিসকে বলে "স্কচ"। আমাদের ইংরিজির মাস্টারমশায় মনোতোষবাবু শিখিয়েছিলেন স্কুলে।

ভাবছিলাম যে গদাই যে কথাটা বলল, তা ভাববার মতো। সাফল্যও মানুষকে ব্যর্থতারই মতো ফ্রাস্টেটেড করে। ব্যর্থ মানুষ হতাশা বোধ করে তার কিছুই হল না বা যা চেয়েছিল তা পেল না বলে। আর সফল মানুষ হতাশা বোধ করে তার আর কিছুই চাইবার নেই বলে। দুজনের ফ্রাস্টেশানের কারণ আলাদা হলেও হতাশাটা

সত্যি। ঠিক এই কোণ থেকে কখনও দেখিনি বা বিচার করিনি ব্যাপারটাকে আগে।

একা ঘরে শুয়ে শুয়ে কত কথাই না মনে আসছিল অসংলগ্ন ভাবে। গদাই বহুবছর হল ঘরে একাই শোয়, স্বেচ্ছায়। আমিও শুই, নিরুপায়ে। কথাগুলি মনে আসছিল আগে পরে। সেই সব আগন্তুক ভাবনার কোনও মাথামুণ্ডুই নেই।

আমি তখনও রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ছিলাম গদাই-এর প্রস্তাবে।

কী করে যে বলল, কেমন করে যে বলল কথাটা, ভেবেই পাচ্ছি না। হাসি জানলে... ?

হাসি কি নাইটি পরে শোয় শোওয়ার সময়ে ? বড়লোকের স্ত্রীরা তো নাইটি পরেই শোয়। কী জানি! কী পরে শোয় হাসি! শুয়ে শুয়ে কী ভাবছে হাসি এই মুহূর্তে, তাই-বা কে জানে! আমার কথা কি ভাবছে ? হয়তো ভাবছে।

কী ভাবছে, তা জানতে খুব ইচ্ছে করে।

ভাবছিলাম, যদি সত্যিই হাসিকে আদর করতাম কোনওদিন, তা হলে কেমন হত ? ভালবাসার শেষ গন্তব্য তো শরীরই! সাধারণত। হাসিকে ছেলেবেলা থেকে এক বিশেষ চোখে দেখেছি যে, তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাকে আদর করার কথা তো কখনও এমন করে ভাবিনি। ভাবতেও লজ্জা করছে। যৌবনে যা ভেবে সহজে উদ্দীপ্ত হওয়া যায়, যে চাওয়ার কল্পনাতে বিনিদ্র রজনী কাটে; তা এই প্রৌঢ়ত্বের শেষবেলাতে এসে চাইতেও বড় ভয় করে।

তা ছাড়া, আমি তো কোনওদিনও কোনও প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে নগ্নাবস্থাতেই দেখিনি। দেখিনি বলব না, একদিন বিডন স্ট্রিটের উপরে এক রবিবার সকালে এক পাগলিকে দেখেছিলাম কিন্তু তার গায়ে এত ময়লা ছিল যে দেখা না দেখা সমানই ছিল আমার কাছে। তা ছাড়া, দেখেছিলাম অনেকই দূর থেকে। তার পাশ দিয়ে যখন হেঁটে গেছিলাম, তখন লজ্জাতে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম। হাসিকে বিবসনা দেখলে ভাল যে লাগবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু এখন হয়তো না দেখাই ভাল।

গদাইটাই আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ মাটি করল। যে ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারত একজন নারী আর একজন পুরুষের ঐকান্তিক কামনাতে, বহু বছরের প্রতীক্ষার পরে, কোনও নিভৃত মুহূর্তে, সেই ঘটনাই এখন গদাই-এর ইচ্ছানুসারে এবং মহানুভবতাতে যদি ঘটানো

হয় তবে তা আর ঘটনা থাকবে না কোনও, দুর্ঘটনাই হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এই ঘটনা ঘটাতে অন্য যার সানন্দ অনুভূতি এবং সহযোগিতা প্রয়োজন তার মতামতটাও এখনও জানা নেই। সে যদি গদাই-এর ভূমিকা জানতে পারে তবে স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত অপমানিত বোধ করবে।

হাসির সঙ্গে এখানে আসা অবধি ভারি খুশি ছিলাম। কতদিন পরে যে এমন এক গভীর ভাল লাগাতে বুঁদ হয়েছিলাম তা কী বলব ! গদাইটা এসেই সব গোলমাল হয়ে করে দিল।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এখন আর ঘুম আসবেও না।

দূর থেকে কদম্বগন্ধী রাতে দুটি পাখির উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ঝগড়া করার আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। কী পাখি তা জানি না। আমি কীই-বা জানি বা চিনি ? কী ফুল, কী গাছ বা কী পাখি। আমার শহুরে জীবন এবং শহুরে শিক্ষা আমাকে এসব বাবদে পুরোপুরি অশিক্ষিতই করে রেখেছে।

বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। শ্রাবণী পূর্ণিমার কাছাকাছি বোধহয়। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে মেঘের চাঁদোয়া ছিঁড়ে গিয়ে স্নিগ্ধ চিকন চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তাতেই বৃষ্টিস্নাত, গাছ-গাছালিরা সুগন্ধি শান্তিনিকেতন এক আশ্চর্য রমণীয়রূপে নবাগন্তুক আমার কাছে রহস্যময়ীর মতো ধরা দিচ্ছিল।

হঠাৎই মনে হল, গান গাইছে নিচু স্বরে কে যেন ! হাসির গলা ? হাসিই তো ! গাইছে কেদারাতে বাঁধা একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত—"কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে।"

এই বর্ষাস্নাত ফুলগন্ধী শ্রাবণের রাতে হাসির এই গান আমার ফেলে-আসা সমস্ত যৌবনটাকে কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়ার সমস্ত অনুষঙ্গকে যেন গন্ধমাদনের মতো উপড়ে নিয়ে এসে আমার বুকের মধ্যে ভাললাগার বিশল্যকরণীকে রোপন করে দিল।

এখন আমার আর কোনও সুখেরই অভাব নেই। আমার আর কখনও অসুখ করবে না। কোনওদিনও নয়।

॥ ১৩ ॥

সকালে বেড়াতে যাওয়া হয়নি।

গদাইও হয়তো বেশি হুইস্কি খাওয়ারই জন্যে দেরি করে উঠেছিল সকালে। রাতে কখন শুয়েছিল কে জানে ! রাতের বন্ধ ঘরের

দরজার আড়ালে কোনও পুরুষ বা নারী কী করে, কী ভাবে, জাগে কিংবা ঘুমায়, হাসে কিংবা কাঁদে, তা তো জানা যায় না! ভাগ্যিস যায় না। চান ঘর এবং শোবার ঘরের আড়াল ও নিভৃতি না থাকলে কোনও মনসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই হয়তো অসম্ভব হত। হয়তো শরীরসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও।

আমিও দেরি করে উঠেছিলাম। ঘরকুনো আমার বহুবছর পরে এই প্রথম রাত কাটানো বাইরে। তার উপরে মনের উপরে গদাই-এর আনা ওই সাংঘাতিক অভিঘাত। আর শরীরের উপরে হুইস্কির। এ-সব তো অভ্যেস নেই। হাসির সঙ্গই যথেষ্ট ছিল তার উপরে গদাই-এর এই গদাঘাত সত্যিই আমার মনোজগতে বড়ই আলোড়ন তুলেছে কাল রাত থেকে। থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়-এর নিস্তরঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত কেরানি আমার পক্ষে বড় স্বল্পসময়ের মধ্যে এত কিছুকে আয়ত্ত করা এবং করেও শান্ত হয়ে থাকা, প্রায় অসম্ভবই ছিল।

জলখাবার খেতে বসে হাসির দিকে ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারছিলাম না। বাইরে মেঘপুঞ্জ ঘনঘটা করে শেষ রাত থেকে সেজে এখন সাজ খুলে ফেলে অঝোর ধারায় ভেঙে পড়েছে। হাসির পিঠময় ছড়িয়ে-থাকা কালো চুলেরই মতো সুগন্ধি সেই শ্রাবণী সকাল।

গদাইও গম্ভীর। গত রাতের প্রগলভতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়েছে। ও কি অনুশোচনা করছে মনে মনে মত্ত অবস্থাতে যা কারওকেই বলার নয় তা আমাকে বলে ফেলেছে বলে। জানি না। তবে আমিও এমন ভাব করছি যে গতরাতে ও আমাকে কিছুমাত্রই বলেনি। যেন ও কোনও দুঃস্বপ্ন দেখেছে রাতে।

হাসি আমার প্লেটে লুচি তুলে দিতে দিতে বলল, ব্যাপার কী আপনাদের ? রাতে কি দু'জনে ঝগড়া করেছেন না কি ?

বললাম, না। হয়তো ঝগড়া করলেই ভাল হতো। এতদিন পরে এমন অবকাশে এমন পরিবেশে দু'জন বাল্যবন্ধুর দেখা হলে ঝগড়া হওয়াটাই স্বাভাবিক।

হাসি বলল, জলখাবার খেয়ে চান করে নিন, আপনাকে একটি ছবি দেখাব। এই বৃষ্টিতে তো ঘর থেকে বেরুনো যাবে না।

কী ছবি ?

অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ম ডিরেক্টর পল কক্স-এর ছবি। 'দ্যা আইল্যান্ড' নাম ছবিটির। শ্রীলঙ্কান একটি মেয়ে নায়িকা ছবিটির। তার চেয়েও

বড় কথা থিম-মিউজিক হিসেবে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে ওই ছবিতে।

কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই বারে বারে কেন পাই না।"

তাই ? আশ্চর্য তো ! বিদেশি ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

হ্যাঁ।

গদাই ঘর থেকে একেবারে চান করেই বেরিয়েছে। মনে হল, প্রতিদিনের অভ্যেস।

ও বলল, যা পচা, নাস্তা করে নিয়েই চান করে নে। তাবপব চল কোপাইতে ঘুরে আসি। সিনেমা-ফিনেমা রাতে দেখিস।

এই বৃষ্টিতে ?

বৃষ্টি ধরে যাবে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কেন ?

আমি বেবোব সেই জন্যে।

তাই ?

হ্যাঁ।

তারপর বললাম, কোপাইটা কী জিনিস ?

কোপাই নদী। শান্তিনিকেতনে এসে কোপাই না দেখলে লোকে কী বলবে।

লোকটা কে ? আমি পুবোপুরি ব্যক্তি। আমার জীবন গাছেব জীবন, অরণ্যের নয়। আমার জীবনে অন্য কোনও গাছ নেই, ছায়া নেই, গাছতলি নেই, গাছের নীচের ফুলশয্যা নেই।

বাবাঃ। তুই তো কবি-সাহিত্যিকদের মতো কথা বলছিস বে পচা। কবিতা-টবিতা লিখিস নাকি ?

হাসি কথা কেড়ে বলল, কবিতা লেখে না কে ? সব মানুষই কবিতা লেখে। কেউ মনে লেখে, মনে কাটে আর কেউ কাগজে। মনে যারা লেখে, তারা জানে যে জলের উপরে নাম লেখারই মতো তা লেখা শেষ হলেই মুছে যাবে। তবুও লেখে। আমারই মতো।

কেন ? মুছেই যদি যাবে, তবে লেখা কেন ?

অভ্যেস। হয়তো না-লিখে পারে না, তাই লেখে।

গদাই বলল, বাঃ। বেশ বলেছ কিন্তু। পচা আসাতে তুমি যেন ঝর্না হয়ে উঠেছ, যেন শিউলি গাছ।

হাসি মুখ ঘুরিয়ে বলল, হঠাৎ ?

কোনটা হঠাৎ ?

আমার এই ঝনা বা শিউলি গাছ হওয়াটা, না তোমার এই কথা বলাটা ?

গদাই বলল, মনে করো দুটোই।

হাসি নিজের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, না, কোনওটাই হঠাৎ নয়। আর যদি শিউলিই হই তবে যেন হঠাৎ ফুল-ফুটোনো শিউলি না হয়ে, বারোমেসে ফুল-ফুটোনো শিউলি হই।

আমি কথা না বলে হাসির দিকে তাকালাম একবার।

আজ সকাল থেকেই ওর দিকে ভাল করে তাকাতেই পারছি না, যেমন পারিনি বিডন স্ট্রিটের উপরে দূর থেকে দেখা সেই বিবসনা পাগলির দিকে। হাসির চমৎকার সাজ সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল ওর দিকে তাকালেই আমি যেন ওকে পোশাকহীন অবস্থাতে দেখতে পাচ্ছি। অথচ সেই অবস্থাতে কোনও নারীকে কেমন দেখায় সে সম্বন্ধে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণাই নেই।

বুড়ো খোকা।

হঠাৎই বলে উঠল গদাই।

কে ?

তুই আবার কে ?

হঠাৎ ?

আমি বললাম।

হাসি হেসে বলল, অশেষবাবুর কথা। আপনিও বলুন না আমারই মতো যে আপনি বারোমেসে।

বারোমেসে কী ?

গদাই জোরে হেসে উঠে বলল।

বারোমেসে বুড়ো খোকা।

আমি বললাম।

বলে, আমিও হেসে উঠলাম।

আমাকে হাসতে দেখে হাসিও সেই হাসিতে যোগ দিল।

হাসির মতো সংক্রামক সুখ আর বেশি নেই। শরীর মনের সব রোগের নিরাময় এই হাসি।

আমার হাসিও তাই। আমার কৈশোর-যৌবনের নেদেরপাড়ার আকাশগন্ধী, বাতাসগন্ধী, চাঁদগন্ধী, ফুলগন্ধী, বারোমেসে শিউলিরই মতো বারোমেসে, চিরকালীন হাসি।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে হাসিকে খুঁজে পাওয়ার পরে কেবলই মনে হচ্ছে যে হাসি ছাড়া আমি আর বাঁচব না। হাসির জন্যে গদাইকে

আম খুনও করতে পারি। অথচ এতগুলো বছর দিব্যি হাসি ছাড়াই কাটিয়ে দিলাম একা একা। হাসি যদি কোনও গরীবস্য গরিবের বউ হত, যদি ঘামে-জবজব হয়ে দারিদ্র্যে পরাভূত হয়ে, একঘেয়েমির সংজ্ঞা হয়ে সে আমার জীবনে আসত, তবেও কি আমার মনোভাব এমনই হত ? আমি কি আজ হারিয়ে-যাওয়া হাসিকেই ভালবাসছি নতুন করে, না তার বৈভবকে ? থুরি ! গদাই-এর বৈভবের মোড়কের হাসিকে ? কে জানে ! মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয়। ভালবাসার রকমও বড় দুর্জ্ঞেয়। কামের রকমও তাই। এক আকাশ আলোর মধ্যে অন্ধকারের প্রতিমূর্তির মতো অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা বহুবছর আগের এক রবিবারের সকালের বিডন স্ট্রিটের সেই নগ্না পাগলির মধ্যে আর আজ সকালবেলায় বাদল আঁধারের মধ্যে মেহগনি কাঠের ডাইনিং টেবলের সামনে মেহগনি কাঠের চেয়ারে সুবেশা হাসির বসে-থাকার ভঙ্গির মধ্যে কোথায় যেন কী একটা মিল দেখতে পেলাম। মনে হল যে, একজনের শরীর নগ্ন ছিল। অন্যজনের মন নগ্ন হয়ে গেছে। চানঘরের দরজা যদি হঠাৎই কোনও দৈব প্রক্রিয়াতে স্বচ্ছ হয়ে যায় তবে যেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয় যে ভিতরে থাকে তাকে এবং যে বাইরে থাকে তাকেও ; তেমনই অবস্থা যেন !

যাবে তো তুমি ?

গদাই বলল, লুচি মুড়ে সন্দেশ খেতে খেতে।

কোথায় ?

কোপাই।

নাঃ। তোমরা যাও। আমার ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না, না এখন ভাল লাগছে না ?

ভাল লাগে না আমার কোপাইকে।

কেন ? সকলেরই তো ভাল লাগে।

হয়তো সেজন্যেই আমার ভাল লাগে না। আমি সমষ্টি নই, জনগণ নই ; আমি একজন ব্যক্তি। আমি আলাদা। আলাদা ছিলাম, আলাদা আছি ; আলাদা থাকব।

তারপরই বলল, আমি থাকি। দই মাংসটা কী করে রাঁধবে আর লালচে বাঙালি পোলাউ তা প্রকাশকে ভাল করে দেখাতে হবে। আমরা তো এখানে আসিই না। এই বাড়িটা এতই personalised—আমারই মতো এত বেশি ব্যক্তি-ব্যক্তি গন্ধ এতে যে ; প্রাণে ধরে বাইরের কারওকে ভোগ করতেও দিতে পারি না। কেউই আসে না এখানে আমি ছাড়া। ফলে, প্রকাশ রান্না-বান্না যা

জানত তাও ভুলে গেছে।

অন্যে যা ভুলে গেছে অথবা অন্যে যা আদৌ জানে না, তা শিখিয়ে দেওয়ার বা নেওয়ার মধ্যে দারুণ আনন্দ পাও তুমি, তাই না ?

বাক্যটা বলতে বলতে গদাই আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি বিব্রত বোধ করলাম।

হাসি বোকার মতো তাকিয়ে থাকল গদাই-এর মুখে। পরক্ষণেই তার মুখের ভাব বদলাতে লাগল দ্রুত। শ্রাবণের আকাশেরই মতো। বেগুনি হয়ে উঠতে লাগল ওর শ্যামলা মুখ।

গদাই বলল, যা, যা চান কর গিয়ে আরেক কাপ চা খেয়ে। চল, বেরিয়ে আসি। আমি তো আর চার ঘণ্টা আছি মাত্র এখানে।

॥ ১৪ ॥

ড্রাইভারকে, মনে হল, ইচ্ছে করেই নিল না গদাই। আমাকে বলল, আয় সামনে বোস।

আমি সামনের দরজা খুলে বসলে, ও ইঞ্জিন স্টার্ট করল। তারপর গাড়ির চাকা গড়িয়ে চলল।

গাড়িটা কি নতুন ?

কেন বল তো ?

কেমন নতুন গন্ধ একটা।

তোর যা নাক। গত জন্মে তুই ছুঁচো ছিলি।

ছুঁচোদের গন্ধবোধ বুঝি খুব প্রখর ?

কে জানে।

তবে ? ছুঁচোর কথা এল কেন ?

ওই ! মনে এল, বলে দিলাম। আমার মা তো ধানবাদের মেয়ে। মা বলতেন "ছুছুন্দরকা শরপর চামেলিকি তেল"।

মানে ?

মানে আর কী ? অপাত্রে বর্ষণ আর কী ! ছুঁচোর মাথাতেও চামেলির তেল !

তারপরই বলল, শুধু নতুন গাড়িতেই নয়, নতুন বইয়ে, নতুন শাড়িতে, নতুন বউয়ে এরকম গন্ধ পাবি। যাকে বলে, Distintive গন্ধ। অন্যের পুরনো বউয়ের গায়েও তোর নাক নতুন নতুন গন্ধ পাবে। আমার কাছে পুরনো হলেও হাসি তোর কাছে তো নতুনই।

আমি বললাম, প্রসঙ্গ বদলা এবার। তোর জন্যে আমার কাল রাতে ঘুম হয়নি।

তাতে কী! আজ রাতেও ঘুম হবে না।

কেন?

আজ হবে না হাসির জন্যে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কাল দুখে হয়নি। আজ সুখে হবে না।

প্লিজ গদাই, তোর পায়ে পড়ি। অন্য প্রসঙ্গে যা। গন্ধরাজ লেবুর মতো সুগন্ধি লেবুও তেতো হয়ে যায় বেশি কচলালে।

বলল, বেশি আর কম কী? তুই তো কোনও লেবুই কচলাসনি।

আমি বললাম, তোর সঙ্গে আমিও যাব।

কোন চুলোতে?

কলকাতাতে।

অমন কবিসনি। আমি তো মোটে আব চারঘণ্টা আছি। দেখিস, আমি চলে গেলেই তোর ভাল লাগবে। হাসিব তো লাগবেই। আমার সঙ্গে গেলে পস্তাবি। এই বিচ্ছিরি জীবনে আনন্দই বল কী ভালবাসাই বল, বোজ রোজ কারও দরজাতে এসেই দাঁড়ায না।

বলেই, আবৃত্তি করল :

> "ভালবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে
> ছায়া ছিল, মায়া ছিল, মুথাঘাস ছিল
> ছাঁচতলায় আর ছিল বৃষ্টিক্ষতগুলি
> ভালবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিল উঠোনের কোণে
> কিন্তু সে পিঁড়িতে এসে তখনো বসেনি
> কেউ, ধীব পায়ে এসে ত্রস্ত, একা একা. ."

কার কবিতা?

পড়িসনি?

নাঃ।

বুঝলি পচা, তুই হয়তো একদিন হাসির কাছের মানুষ ছিলি। আজ আর তা নেই। হয়তো হতেও পারবি না। তোদের দুজনের মধ্যে অনেকই ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। হাসি তো কবিতা, গান এ-সব নিয়েই থাকে। তুই একটা যা তা শালা! শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই বহুপঠিত কবিতাটাও শুনিসনি।

কী করব। আমি যে গরিব কেরানি।

"শালা" কথাটা বলাতেই গদাইকে আবার তার ন্যাচারাল ফর্ম-এ

দেখে খুশি হলাম আমি। আজ সকাল থেকে একবারও শালা বলেনি। খুবই অস্বস্তি লাগছিল আমার।

আমার কথাতে গদাই হাসল। হাঃ।

তারপরে বলল, তুই দেখি আমাদের পাড়ার ঘাসিরাম রিকশাওয়ালার মতো কথা বললি।

কেন ? সে কী বলেছিল ?

তার যখন এগারো নম্বর ছেলে হল, মানে, ছেলে হওয়ার খবর নিয়ে চিঠি এল দেশ থেকে তখন আমরা মানে, হাবু আর সতু, ওদের চিনতিস তো তুই, যমজ ভাই রে, জগদানন্দ স্কুলেই আমাদের চেয়ে এক ক্লাস নিচে পড়ত, মনে নেই ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

আরে ওরা তো আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকত।

তা তো হল। ঘাসিরাম কী বলেছিল, তাই বল ?

হ্যাঁ। ঘাসিরামকে আমরা সবাই মিলে একটু কড়কে দিলাম ; ওকে বললাম, তোমার লজ্জা করে না ঘাসিদাদা। তুমি নিজে খেতে পাও না আর তোমার এগারো নাম্বার ছেলে হল।

কিন্তু এগারো নাম্বার ছেলে হওয়ার আহ্লাদে আহ্লাদিত ঘাসিরাম বলল, কেয়া করেগা বাবু ! হামলোগ গরিব আদমি হ্যায়। ডজন পুরা করকে ছোড় দেগা ! তুইও দেখি সেইরকমই বললি। কবিতা পড়ার সঙ্গে গরিব-বড়লোকের কি !

কিছুক্ষণের মধ্যেই কোপাই-এর পাড়ে পৌঁছলাম আমরা। খোয়াইয়ে খোয়াইয়ে ভরে গেছে জায়গাটা। কিছুদিন বাদে হয়তো এই খোয়াই বুঁজিয়েও বাড়ি করবে কলকাতা শহর থেকে আসা-মানুষে।

কিছুদিন পরে কাশ ফুটবে খুব এখানে। পুজোর আগে কাশে কাশে ভরে যাবে।

স্বগতোক্তির মতো বলল গদাই।

ভাবছিলাম, গদাই-এর মধ্যে যে এমন একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন, সাহিত্য ও গান-বাজনা ভালবাসা, সুরুচিসম্পন্ন মানুষ বাস করে সে খবর কোনওদিনও রাখিনি।

ভাবছিলাম স্কুলের, দিনের থেকে শুধু গদাই-ই নয় আমরা প্রত্যেকেই কতই না বদলে গেছি। বদলে গেছে হাসিও। বোধহয় বদলায় সকলেই, কম আর বেশি। হাসিকে যতখানি জানি বলে মনে করতাম, ঝাবুর শ্বশুরবাড়িতে দেখা হওয়ার পরে, এখন দেখছি

ততখানি আদৌ জানি না। মানুষের জীবনের গতি নদীরই মতো। চলতে চলতে কোথায় যে সে বাঁক নেয়, কোথায় পাড় ভাঙে কোথায় চর ফেলে, তা কি নদী নিজেই জানে আগে থেকে ?

গদাই-এর মুখে শুনে গদাই যে একটি ব্যাপারে অপারগ এ-কথাই বিশ্বাস করে নিয়েছি। গদাই যে-ধরনের বিচিত্রবীর্য এবং কৃতবিদ্যও হয়ে উঠেছে, ও যে আমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই ওই গল্প ফাঁদেনি তাই-বা কে জানে! অপারগতা হয়তো হাসিরই। এই পুরো ব্যাপারটাই হয়তো ওর এক নতুন চাল। অথবা ফাঁদও হতে পারে। আমাকে ধরে ফেলার ফাঁদ।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আবার মেঘ করে আসছে। হাওয়া দিয়েছে একটা। খোয়াই-এর উপরে সেই হাওয়ার শব্দ দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনাচ্ছে।

হঠাৎই গদাই বলল, গুটলুটার উপরে বড় রাগ হয় মাঝে মাঝে।

কেন ?

এই রিইউনিয়ন বোধহয় না করলেই ও ভাল করত।

যা বলেছিস। এ-কথা আমিও ভেবেছি অনেকবার। স্কুলের যে স্মৃতি ছিল আমাদের মনে, টিফিন ভাগ করে খাওয়ার, পড়াশুনোর, খেলাধুলোর, মারামারির...

মনে আছে ? ঝাবুকে একবার বাগবাজারের ঘেটো গুণ্ডা সাইকেলের চেন দিয়ে দারুণ মেরেছিল! ঝাবুর কপাল ফেটে গেছিল। তখন আমরা সকলে মিলে পাইকপাড়াতে ঘেটোকে waylaid করে কেমন শিক্ষা দিয়েছিলাম।

মনে নেই আবার! তুই তো আবার কোথা থেকে একটা পাঞ্জার জোগাড় করে এনেছিলি।

গদাই হাসল।

বলল, আমাদের আর্মারিতে কি সেদিন শুধুই পাঞ্জার ছিল! হকি স্টিক, লোহার রড, সাইকেলের চেন...

আর ক্লাস টেনের পটলা সোডার বোতল নিয়ে গেছিল মনে আছে ? সোডার বোতল ছোড়ার কায়দাটা কী দারুণ রপ্ত করেছিল ও।

হ্যাঁ।

ঘেটো আর তার তিনজন প্রফেশনাল সাকরেদকে আমরা পেঁদিয়ে লাট করে দিয়েছিলাম। সবাই বলেছিল, ঘেটো আমাদের 'জান'-এ মেরে দেবে। বদলা নেবে। কিন্তু কই ? কী করল ?

আমি বললাম, মারামারিই বল, যুদ্ধই বল, তার পেছনে যদি সমর্থনযোগ্য কোনও কারণ না থাকে তবে সে মারামারি বা লড়াইয়ে হার হতে বাধ্য। হবেই। আজ বা কাল।

কারেক্ট।

গদাই বলল।

এই রিইউনিয়ন করতে গিয়ে আমাদের সেই মধুর স্মৃতিটাই ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল। যা দূরে চলে যায় তাই সুন্দর। অতীতের স্মৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখের। রিইউনিয়ন করলেও স্কুল কলেজ ছাড়ার পাঁচ বছরের মধ্যে করলে এবং তারপর ঘনঘন করতে পারলে তাও হয়তো অতীতের তাপ এবং আর্দ্রতা কিছুটা বজায় রাখা যায়। এত বছর পরে জোর করে রিইউনিয়ন কখনওই হয় না।

ছেলেবেলাতে আমরা কে বড়লোক, কে গরিব, কার স্ত্রী কীরকম, কার ছেলেমেয়ে কেমন কৃতী এসব কোনও কিছু নিয়েই তো মাথা ঘামাতাম না। আমরা সত্যিই এক-একজন ব্যক্তি ছিলাম। চারাগাছের মতো। কোনও শাখা-প্রশাখা ছিল না আমাদের কারওই। আমরা চলমান ছিলাম। এরকম সর্বার্থে স্থবির হয়ে যাইনি ব্যবসা, চাকরি, বউ, ছেলেমেয়ে, দম্ভ, গর্ব, নানারকম হ্যাঙ্গ-আপস নিয়ে। ঈর্ষা কী বস্তু আমরা জানতাম না।

ঠিক বলেছিস। সেদিন তোরা ঠিকই বলেছিলি।

কী?

যে পরেশকে এবং অন্য অনেককে না বলে গুটলু এবং ঝাবুরা ঠিকই করেছিল।

আমি বলিনি। স্থিতপ্রজ্ঞ আর ঝাবু বলছিল।

গদাই বলল।

তুইও বলেছিলি।

তাই?

বলল, একথা তো সত্যিই স্কুলের জীবনে পরেশ আমাদের যত বড় বন্ধুই থাক না কেন আজকের পরেশ আর কখনওই আমাদের সেরকম বন্ধু হতে পারবে না। আমরাও পারব না ওর বন্ধু হতে। আর্থিক অবস্থার তারতম্য মানুষের মানসিকতাকে এতখানি বদলে দেয় যে জোর করে বন্ধুত্ব করা যায় না। এটা বড় দুঃখময় সত্য। সত্যিই রে, আমাদের আর দেখা না হলেই হয়তো ভাল ছিল।

তুই কি সত্যিই গোয়েন্দা লাগিয়েছিলি সকলের পেছনে?

দুসস। তুই ঠিক সেইরকমই ইডিয়ট আছিস। আমার যেন খেয়ে

দেয়ে কাজ নেই। ওরা কি আমার কমপিটিটার? কত খরচ জানিস গোয়েন্দা লাগাতে। তোকে একটু ভড়কি দিলাম, তুইও গিলে নিলি কপাত করে। তবে স্থিতপ্রজ্ঞ যে স্মাগলিং করে, সোনা স্মাগলিং; তা আমি জেনেছি বিশ্বস্ত সূত্রে।

আর অন্যেরা?

না, অন্যেরা সৎপথেই বড়লোক হয়েছে, বহুত টাকা করেছে। বড়লোক হয়েছে কিন্তু টাকা হজম করতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষেই পারে না। টাকা করা সোজা, টাকা হজম করা বড় কঠিন। আর এই বদহজম তো জেলুসেল, এম.পি.এস. বা পলিক্রল খেলে যায় না। ঢেকুর উঠতেই থাকে। চারধারে চোখ খুলে চেয়ে হাঁটলেই বুঝবি। ঢেকুরের শব্দে পথ চলা দায়।

চল এবারে।

চল। তোকে ফেরার সময়ে ক্যানালের ধার এবং অ্যান্ড্রুজ পল্লীটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। হাসি তো প্রায়ই আসে। আসিস না তুই ওব সঙ্গে। এলে, আমি খুশিই হব।

আমি ওকে না বলেই বললাম, হাসিও আর সেই হাসি নেই। নেদেরপাড়ার আলোছায়ার বুটি-কাটা গালচেতে লাল-হলুদ ফ্রক-পরা, দোলনা চড়া, প্রজাপতি-ধরা, প্রজাপতির মতো কিশোরী হাসি অথবা সাদা-কালো ডুরে শাড়ি-পরা সাদা ব্লাউজ-পরা কাঠবিড়ালির মতো সদ্য-যুবতী হাসি। আমার মামাবাড়ির অবস্থার সঙ্গে ওদের বাড়ির অবস্থার তখন সমতা ছিল। তখনকার আমাদের বাড়িরও। আজকে আমার সেই মানসী হাসিকে শত খুঁজলেও আমি আর খুঁজে পাব না প্রচণ্ড বড়লোকের স্ত্রী, আদব-কায়দাতে রপ্ত, কথায় কথায় ইংরেজ-ফুটোনো এই হাসির মধ্যে।

আমরা যখন অ্যান্ড্রুজ পল্লীর দিকে যাচ্ছি তখন আমি বললাম, গদাই, আমিও তোর সঙ্গে ফিরে যাব শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস-এ।

হঠাৎ? কী হল?

কিছু হয়নি। এমনিই। পরে আবার আসব কখনও। তুই যখন আসবি তখন তোর সঙ্গেই আসব।

সে কী রে! তোর এতদিনের প্রেমিকাকে এত অল্প সময়ের মধ্যেই খারাপ লাগছে?

কে বলল?

তবে? তোকে বললাম আমার ছেলের বাবা হতে। আচ্ছা, এমন বন্ধুকৃত্য কতজন বন্ধু করতে পারে বল? তোর-আমার রিইউনিয়ন,

তোর আর হাসির রিইউনিয়ন, মেন্টাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিক্যাল।

তারপরই বলল, গুটলুটা জানলে আনন্দে ডিগবাজি খেত।

আমি বললাম, সবুজ, গুটলু, সুশান্ত, ন্যাকা এদের সম্বন্ধেও তুই আমাকে যা সব বলেছিলি, মানে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে, সেসবও কি বানানো?

পুরোপুরি।

কেন এমন করে চরিত্র-হনন করলি তবে?

আরে শালা, চরিত্র-হনন তো চিরকাল অমন করেই করা হয়। সত্যি বলে, কে আর কবে কার চরিত্র-হনন করেছে বল? তা ছাড়া, চরিত্র ব্যাপারটাও এই রিইউনিয়নেরই মতো একটা misnomer। অ্যাকাউন্টেনসির ভাষাতে একে বলে, Intangible Asset। থাকলেও প্রমাণ করা যায় না যে আছে আর না থাকলেও তার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না। তাই দিলাম একটু নেড়ে-চেড়ে।

সত্যি! তুই একটি, ডেঞ্জারাস মানুষ।

তোর বুঝতে এত বছর লাগল। মদনবাবু কিন্তু তখনই বুঝেছিলেন।

হাসতে হাসতে বলল গদাই।

কোন মদনবাবু?

জগদানন্দ স্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশাই। বলেছিলেন না ক্লাসে একদিন? এই অশেষচন্দ্র বোস-এর মতো ডেঞ্জারাস ক্যারেক্টার হিস্ট্রিতে আগেও কখনও হয়নি, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। অ্যাট লিস্ট আই হ্যাভ লিভড আপটু মাই রেপুটেশান! কী বল? বলেই, হাসল গদাই।

॥ ১৫ ॥

হাসি বলল, অবুদা, আপনি সত্যিই চলে যাবেন? উইক-এন্ডটা থেকে গেলে কী হত?

আমি বললাম, একেবারে মনে ছিল না আজ আমার ছোটবউদির জন্মদিন। আজ সন্ধের মধ্যে কলকাতা না পৌঁছলেই চলবে না। সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। কিছুই মনে থাকে না আমার আজকাল। জানি না, আপনাদের মন কী রকম।

গদাই বলল, সময়মতো বিয়ে না করলে এমনই হয়। সব বীর্য

মাথায় গিয়ে জমা হয়েছে।

আমি ওর রসিকতা অ্যাপ্রিসিয়েট না করে বললাম, পবে আসব। তুমি যখনই আসবে, ছুটি-ছাটাতে তখনই খবর দিও, চলে আসব। আমার তো যাওয়ার জায়গা নেইই বলতে গেলে। কোনও জায়গাই নেই।

টেবলে খাবার লাগাচ্ছিল প্রকাশ, হাসির রান্নাব লোক অথবা বাবুর্চি।

গদাই বলল, আমি কলকাতাতে একটা ফোন কবেই আসছি। পচা, তুই বোস খেতে।

হাসি আহত হয়ে ছিল খুবই। ওর মনে হয়তো কোনও সন্দেহও দানা বেঁধেছিল যে গদাই-ই বোধ হয় আমাকে চলে যেতে প্রবোচিত করেছে। গদাইটা সত্যিই যে রকম ডেঞ্জারাস চরিত্রর মানুষ, হাসি ওর সঙ্গে এতগুলো বছর কাটাল যে কী করে তা ও-ই জানে। হাসিও ডেঞ্জারাস না হলেও কেমন রহস্যময়ী হয়ে গেছে। বড়লোকদের প্রেম-অপ্রেম, দাম্পত্য-বিচ্ছেদও বোধহয় আমাদেব মতো সাধাবণ মানুষদের বোধ-বুদ্ধির বাইরে। এখানে এসে সবকিছুই গোলমাল হয়ে গেল আমার।

হাসি বলল, অবুদা, আপনার জন্যে গন্ধরাজ লেবু আনিয়েছি। পাঁঠার মাংসর ঝোল দিয়ে খেতে ভাল লাগবে।

মনে পড়ে গেল যে গদাই একটু আগেই গন্ধরাজ লেবু কচলানোর কথা বলছিল।

ভাবছিলাম, লেবুতে লেবুতে কত তফাত।

গদাই দোতলা থেকে চটি ফটফটিয়ে নেমে আসতে আসতে বলল, আমি দুটো দিন থেকেই যাব এখানে। এখুনি বিদেশ যেতে হবে না। দিল্লি যাব, তাও পরের সপ্তাহে। এসেই যখন পড়েছি আর যাওয়াটাও যখন পেছোল তখন থেকেই যাই। তুমি কী বলো?

বলে, হাসির দিকে তাকাল।

হাসি বলল, আপনার বাড়ি, আপনি থাকবেন, আমার বলা-না-বলার কী আছে?

পচা, তুই কি সত্যিই থাকতে পারবি না? আর পচা যদি থাকতে না-ই পারে তবে তুমিও কি পচার সঙ্গে কলকাতা ফিরে যাবে? যেতে চাইলে যাও। আমার কোনও আপত্তি নেই। উইক-এন্ডটা পচা আর তুমি কলকাতার বাড়িতেই না-হয় কাটাও। পচা যেখানে থাকবে সেখানেই তো শান্তিনিকেতন।

হাসি কথা না বলে, একবার আমার আর একবার গদাই-এর দিকে তাকাল। গদাই-এর প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না।

খাওয়া-দাওয়ার পরই গাড়ি বের করতে বলল ড্রাইভারকে গদাই।

বলল, সত্যিই যদি যাস, তবে আর দেরি করিস না। আমার টিকিটেই চলে যা। কলকাতা থেকেই টিকিট নিয়ে এসেছিলাম আমি।

আমি বললাম, হ্যাঁ। চলেই যাব।

বলে, বেসিনে হাত ধুয়ে ঘরে গেলাম। গোছগাছ করে করে নিতে।

স্যুটকেশ হাতে নিয়ে ফিরে এলে গদাই বলল হাসিকে, তুমি পৌঁছে দিতে যাবে না পচাকে স্টেশনে?

নাঃ।

বলল হাসি।

আমার খুব অপমানিত লাগছিল। গদাইকে ঝাবুর বাড়িতে যেমন বুঝেছিলাম, গদাই আসলে কি সেরকমই? ওকি হাসির উপরে অত্যাচার করবে আমি চলে যাবার পরে? আমাকে নিয়ে হাসি শান্তিনিকেতনে এসেছিল বলে? হাসির কি মুক্তি নেই ওর কবল থেকে? এই খল, ধূর্ত, ইতর, প্রচণ্ড পয়সাওয়ালা ডেঞ্জারাস মানুষটার হাত থেকে?

মুক্তি হয়তো আছে। নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই মুক্তি আমার মতো ছুঁচোর মাধ্যমে আসবে না কোনওদিনও। গদাই-এর মতো কোনও বড়লোক, সুতানুটি ক্লাবের মেম্বার, গুকুগুকুর মতো কোনও দেশের কনসাল যদি গদাই-এর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে তবেই হয়তো হাসির মুক্তি সম্ভব।

হঠাৎ হাসি বলল, রতন, একটা রিকশা ডাক তো।

রিকশা কেন?

রিকশা করে অবুদাকে পৌঁছাতে যাব আমি স্টেশনে।

গাড়ি কী দোষ করল?

না, গাড়িতে যাব না। সময় আছে এখনও। পৌঁছে যাব।

গদাই বলল, তুমিই মালকিন। যা ভাল মনে করো করবে।

রিকশা এল।

আমি বললাম, চলি রে গদাই।

গদাই বলল, যেন চিরদিনের মতোই চললি! শালা!

আমি উত্তর দিলাম না।

রিকশাটা পূর্বপল্লীর পথে পড়তেই হাসি বলল, অবুদা, আপনার জন্যে আমি দুবার মরলাম। আপনি কি পুরুষ ?

আমি চুপ করে থাকলাম।

হাসি বলল, আমার ভাগে দশ কাঠা জমি পড়েছে বীরনগরে যেখানে লালগোলা প্যাসেঞ্জারের ক্রশিং হয়। সেখানে একটি ছোট্ট দু' কামরার বাড়ি আর বাগান করে থাকা যায় না ? মানে, দুজনে ? আপনার সঞ্চয় বলতে কি কিছুই নেই অবুদা ?

আমি মাথা নাড়লাম।

মনে মনে বললাম, তুমি আমার কে হাসি ? তোমার চেয়ে আমার ছোটবউদি আমার অনেকই কাছের মানুষ। আমারই মতো অবস্থার, মানসিকতার, আমার সুখের দুঃখের ভাগীদার। তুমি সারাজীবন আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছ। তোমার দুঃখের ভাগও তুমি নাও। গুটলুর রিইউনিয়নের জের হিসেবে, যে-তুমি আমার নও, যে-জীবনে আমার অস্বস্তি সেই তোমাকে এবং সেই জীবনে আমি প্রবেশ করতে যাব কী করতে। এ তো হিন্দি সিনেমা নয়। জীবন অনেক বেশি বাস্তব। এখানে প্রত্যেক মানুষই নিজের নিজের দুঃখের যোগ্যতা বা দায় নিয়ে আসে। অন্যে তার বোঝা বইতে পারে না। আমি অন্তত পারি না গদাই ওরফে অশেষচন্দ্র বোসের বোঝা বইতে। ভাগ্যিস গদাইটা এসেছিল। ও না এলে কতবড় ভুল করে ফেলতাম কে জানে!

হাসি বলল, আপনাকে কত কীই-না ভাবতাম! কত কী কল্পনা করেছিলাম আপনাকে নিয়ে।

আমি বললাম, আমিও। কিন্তু কল্পনা, কল্পনাই।

ট্রেন এসে গেছিল। ছেড়ে যাবে একটু পরেই।

হাসিকে বললাম, তুমি আর নেমো না। এই রিকশা নিয়েই ফিরে যাও।

ঠিক আছে।

হাসি বলল। অভিমানভরে।

আমি রিকশা থেকে নেমে, স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে, হাত নাড়লাম।

হাসি হাতও তুলল না।

ছলছলে চোখে রিকশাতে বসে রইল।

ওর জন্যে আমার বড় কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু আমি আর কোনওদিনও হাসির হাত ধরে কোথাওই পুজো দেখতে যেতে পারব

না। হাসিও আর কোনওদিন আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, শিউলি ফুলের ভাল নাম কী ?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে, ট্রেনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম, কারও জীবনই এক জায়গাতে থেমে থাকে না। থেমে থাকে না শিউলির গন্ধ। শিউলি, খুব কম ভাগ্যবানের আঙিনাতেই বারো মাস ফোটে। কোনও শৃঙ্গারই চিরায়ত হতে পারে না। হরশৃঙ্গারও নয়।

হারামজাদা গুটলুটা আমার কৈশোর যৌবনের নেদেরপাড়ার সমস্ত সুখস্মৃতি, আমার অনেক ভালবাসার হাসিকে ধুনুরী যেমন করে তুলো ধোনে, তেমনই করে ধুনে আকাশময় ছড়িয়ে দিল।

"কংগ্রেগেশান", "অ্যাসেম্বলী" এসব কথার মানে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু "রিইউনিয়ন" শব্দটি সত্যিই মিসনোমার। "পুনর্মিলন" কখনও "মিলনের" সমার্থক হয় না। হওয়ানোর চেষ্টাটাই বাতুলতা।

ট্রেনে ওঠার আগে একবার পেছনে তাকালাম। ততক্ষণে হাসি রিকশা ঘুরিয়ে নিয়েছে। রিকশার হুডও তুলে দিয়েছে টিপটিপে বৃষ্টি শুরু হওয়াতে। ওর শাড়ির রঙ দেখেই অনুমান করে নিতে হল যে, ঐ মহিলাই হাসি।

———